স্মৃতিকথা — প্রচ্ছদ

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

প্রকাশ কালঃ ১৯৫৬

Made with □ by টেলি বই □□

✓ t.me/bongboi

এ ধরনের আরও বই পান □ এখানে।

😸 Generated from WikiSource

1. শিরোনাম
2. স্মৃতিকথা — প্রচ্ছদ
3. ছেলেবেলার কথা
4. বিবাহের কথা
5. বম্বের কথা
6. বিলাতের কথা
7. নাম-পরিচিতি
8. সম্পর্কে

1. স্মৃতিকথা — প্রচ্ছদ
2. সম্পর্কে

সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী

স্মৃতিকথা

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১
৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ-১
১১ ওক্ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই-১

প্রচ্ছদশিল্পী :
গণেশ বসু

মুদ্রক :
মনোতোষ পোদ্দার
শশধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১৩/১ হায়াৎ খাঁ লেন
কলকাতা-৯

পরিচ্ছেদসমূহ (মূল গ্রন্থে নেই)

সূচীপত্র

ছেলেবেলার কথা

বিবাহের কথা

বম্বের কথা

বিলাতের কথা

নাম-পরিচিতি

ছেলেবেলার কথা

(বাপের বাড়ী)

"যশোর নগরধাম প্রতাপ আদিত্য নাম"—সেই যশোর নগরধামের অধিকারভুক্ত নরেন্দ্রপুর গ্রাম আমার জন্মস্থান। শুনেছি নরেন্দ্র রায় বলে এক প্রবলপ্রতাপ লোক ছিলেন, তাঁর নামে এই গ্রামের নামকরণ হয়। বংশের পরিচয় বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। সেই সুদূর বালিকাকালের ঝাপ্‌সা স্মৃতিপটে সনতারিখশূন্য অগ্রপশ্চাৎ সীমাবিহীন যে দুচারটে জিনিস অঙ্কিত আছে, তাই বলছি।

শুনেছি আমার ঠাকুরদাদারা কৃষ্ণনগর অঞ্চলের লোক ছিলেন। তাঁরা নাকি কুলীন ব্রাহ্মণ ফুলের মুখুটি ছিলেন। মায়ের মুখে শুনেছিলুম যে, তাঁর শ্বশুরের নামের সঙ্গে মেলে বলে তিনি 'নীল' আর 'কম্বল' এই দুটো কথা উচ্চারণ করেন না, তাই বুঝেছিলুম যে তাঁর নাম ছিল নীলকমল মুখোপাধ্যায়। আমার বাবামশায় আট নয় বৎসর বয়সকালে, কি কারণে জানিনে, তাঁর বাপের উপর রাগ ও অভিমান করে' ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। লক্ষ্যহীনভাবে পথে চলতে চলতে তিনি যশোরের দক্ষিণদিহি গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। সেই গ্রামে সে সময় রায়বংশের একটি বড় ও সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবার বাস করতেন। ঘটনাক্রমে বাবামশায় সেই পরিবারের কর্তাব্যক্তির সামনে এসে পড়েন। তিনি দিব্য একটি সুন্দর ছেলে দেখে, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে কাছে ডেকে নামধাম ও সমস্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। বাবামশায় তাঁর নামধাম ও বংশপরিচয় যা দিলেন তাতে রায়মহাশয় যেন বেশ সন্তুষ্ট হলেন, আর বল্লেন,—তুমি ছেলেমানুষ, একলা একলা কোথায় ঘুরে বেড়াবে; আজ থেকে আমার এখানে থাকো। পরের ঘটনা থেকে মনে হয় যে, প্রথম থেকেই রায়মশায়ের মনে ছেলেটিকে বাড়ীতে রাখবার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। বাবামশায় সম্মত হওয়ায় রায়মশায় তাঁকে যত্নের সহিত লালন-পালন করতে লাগলেন। তখনকার মতে বিয়ের বয়স হলে রায়মশায় তাঁর নবম বর্ষীয়া কন্যা নিস্তারিণী দেবীর সঙ্গে বাবামশায়ের বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই করে রাখলেন। আমার ঠাকুরদাদা তাঁর ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর থেকে বরাবরই তাঁর খোজ করছিলেন, কিন্তু এতদিন খোঁজ পাননি। বাবামশায়ের বিয়ে হবার পর তিনি খবর পেলেন যে, তাঁর ছেলে দক্ষিণদিহির কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে আছেন। খোঁজ পেয়ে যখন তিনি দক্ষিণদিহিতে এসে শুনলেন যে, পিরালী ঘরের মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে হয়েছে, তখন তিনি রাগে দুঃখে একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়লেন আর পৈতে ছিঁড়ে শাপ দিলেন যে, অভয়াচরণ নির্বংশ হোক্। বাবামশায়ের নাম ছিল অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়।

বছর কতক পরে বাবামশায়ের মনে ঘরজামাই থাকতে ভারী একটা বিতৃষ্ণা জন্মালো। তখন তিনি কোনরকমে লুকিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে

পড়বার নানান উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। একদিন দুপুর রাত্রে স্ত্রীকে জাগিয়ে তাঁর হাত ধরে দক্ষিণদিহি থেকে নরেন্দ্রপুর গ্রামে চলে এলেন। শ্বশুরের অনেক চেষ্টাতেও আর শ্বশুরবাড়ী ফিরলেন না। নরেন্দ্রপুরে কোন এক কাছারিতে তিন চার টাকা মাইনের একটা চাকরি করতে লাগলেন। মায়ের কাছে শুনেছি সেই সময়টা তাঁর বড়ই কষ্টে গিয়েছে। বাপের বাড়ী ছেড়ে আসার দুঃখ, তাছাড়া তখন তিনি ঘরসংসারের কাজকর্ম কিছুই জানতেন না। পাড়ার কোনো কোনো গৃহিণী তাঁর দুঃখকষ্ট দেখে কিছু কিছু ঘরের কাজ দেখিয়ে শুনিয়ে দিতেন। অল্প আয়ের সংসার, জ্বালানি কাঠ পর্যন্ত তাঁকে বনজঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে আনতে হত, কাঁটা খোঁচায় হাত ছড়ে গেলেও কাঁদতে কাঁদতে ডাল ভেঙ্গে এনে উনুন ধরাতে হত। কতক দিন এরকম দুঃখেকষ্টে কাটবার পর কলকাতার এক খুব ধনী জমিদার মহিলা কোন সূত্রে বাবামশায়ের সব খবর শুনতে পেয়ে তাঁকে কলকাতায় এনে একটা বেশী আয়ের কাজে নিযুক্ত করে, নিজের বাড়ীতে যত্নে রাখেন। তিনি বরাবর কলকাতায় থাকতেন, কেবল পুজোর সময় একমাস বাড়ী আসতেন। সেই সময় আমি মায়ের গর্ভে ছিলুম। মা আমায় যখন-তখন বলতেন যে, তুমি আমার গর্ভে এসে অবধি আমার দারিদ্র্য-দুঃখের শেষ হয়েছে।

সেই মহিলাটি বাবামশায়কে দাদা বলে ডাকতেন। আমি জন্মাবার পর, যখন আমার অন্নপ্রাশনের সময় হল তখন আমার এই ধনী পিসিমা আমার অন্নপ্রাশনের সমস্ত গয়না কাপড় ও খরচপত্র পাঠিয়ে দেন শুনেছি। আর কোন সময় নরেন্দ্রপুরের কাছাকাছি গ্রামে খুব চুরি-ডাকাতি হচ্ছে শুনে পিসিমা আমাদের বাড়ী পাহারার জন্যে নিজের খরচে দুজন পাঠান দরওয়ান রাখিয়ে দিয়েছিলেন। তারা আমাকে সকালে-বিকালে কোলে কোরে নিয়ে বেড়াত, সেটা এখনও মনে আছে। আমার যখন আড়াই বছর বয়স, তখন পিসিমার বিশেষ অনুরোধে বাবামশায় মাকে ও আমাকে তাঁর ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা কিছুদিন পুজোর সময় সেখানে গিয়েছিলুম। সেই অনভ্যস্ত প্রকাণ্ড বাড়ী, জাঁকজমক ও মেলাই চাকর-দাসীর মাঝখানে মা যেন সর্বদাই ভীত সঙ্কুচিত হয়ে থাকতেন। বাড়ীর কর্ত্রী পিতার ঘরজামাই মেয়ে ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর কলকাতার অট্টালিকার ও জমিদারীর অধিকারিণী হন। তিনি অসাধারণ দানশীলা ছিলেন। পুজোর সময় জমিদারীর আমলা ও বাড়ীর চাকর-দাসীদের নতুন কাপড় বিতরণ করবার সময় তিনি মাকে সেই ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে বসালেন। মা দেখলেন যে, একটা বড়ঘরের মেঝে থেকে কড়িকাঠ পর্যন্ত নববস্ত্রে পরিপূর্ণ। একে একে ছোটবড় সমস্ত কর্মচারী ও চাকর-দাসী আসতে লাগ্‌ল আর তিনি তাদের নতুন কাপড় দিতে লাগলেন। মায়ের মনে হল যে, সে যেন এক অফুরান বিরাট দানব্যাপার। শুনেছি ঐ সময়েই নাকি আমার এই পিসিমা আমার ভাবী শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে আমাকে দেখাতে নিয়ে যান, আর তাঁর এক ছেলের সঙ্গে

আমার বিয়ের কথা বলেন। এত জাঁকজমক গোলমালের মধ্যে আর বেশীদিন থাকতে মায়ের ভাল লাগছিল না। তাই বাবামশায় আমাদের নরেন্দ্রপুরের বাড়ীতে এনে রেখে গেলেন।

আমরা প্রথমে যে বাড়ীতে ছিলুম, সে বাড়ীর কথা আমার বিশেষ কিছু মনে পড়ে না। তারপর যে আর এক জায়গায় থাকতে গেলুম, সেই বাড়ীর ঘরদের আমার কিছু কিছু মনে আছে। আলাদা আলাদা এক-একখানা ঘর, একটা দক্ষিণের, একটা পশ্চিমের আর একটা উত্তরের—সেইটেই সবচেয়ে বড়। এই তিন ঘরের সামনে একটা বড়ো উঠোন। দক্ষিণের ঘরের একটু পিছন দিকে রান্নাঘর, তার সামনে আর একটা উঠোন। সমস্ত ঘরগুলির চারিপাশে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দক্ষিণের আর উত্তরের ঘরের মাঝের পাঁচিলে সদর দরজা ছিল। দরজার বাইরে উত্তর দিকে একটা বড় ঘর ছিল আর দক্ষিণ দিকে দরওয়ানদের থাকবার একটা ঘর ছিল। তার পরেই চারিদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা ফুলবাগান ছিল। বাগানের প্রতি বাবামশায়ের অসাধারণ অনুরাগ ছিল। সেই ফুলবাগানে তিনি অনেকরকম দুর্লভ ফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন। পশ্চিমের দিকে অনেকটা জমি ছিল। তাতে একটা পুকুর কাটিয়েছিলেন, তার এক পাড়ে একটি বড় কলাবাগান আর অপর তিন পাড়ে অন্যান্য গাছ লাগানো ছিল। সেই পুকুরের জলেই আমাদের স্নান পান রান্না সব কাজ চলত। একবার বাবামশায়ের গুরুমশায় এসে কথায় কথায় বলেছিলেন যে, সব দানের চেয়ে বিদ্যাদান বড়। তাই থেকে বাবামশায়ের মনে হল যে পাঁচিলের বাইরে উত্তরের বড় ঘরটায় একটা পাঠশালা বসাবেন। তার জন্য একজন গুরুমশায় রাখা হল, আর শীঘ্রই অনেক পোড়ো এসে জুট্‌লো। পাঠশালা রীতিমত চল্‌তে লাগ্‌ল। তখন বাবামশায়ের মনে হল যে, বাড়ীতেই যখন পাঠশালা হল, গুরুমশায়ও রাখা হল, তখন আমার মেয়েটিকেও পাঠশালায় পড়তে দিই—ছোট মেয়ে, তাতে বোধ হয় কোন দোষ হবে না। সে সময় ওদেশে মেয়েদের লেখাপড়া বড় নিন্দনীয় ছিল। আমি একদিন রাত্রে হঠাৎ জেগে উঠে মাথা তুলে দেখি যে আমার মা কি লিখছেন না পড়ছেন, আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি সেগুলো সব ঢেকে ফেল্‌লেন, পাছে আমি ছেলেমানুষ কাউকে বলে ফেলি। আমাদের এক প্রতিবেশিনী বয়স্কা আত্মীয়া লেখাপড়া জানতেন, লোকনিন্দার ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে হিসেব-কিতেব চিঠিপত্র লিখতেন। তবু কিরকম করে' টের পেয়ে লেখাপড়া করেন বলে পাড়ার লোকে তাঁর নিন্দা করত। পাঠশালা সম্বন্ধে আমার যা-কিছু জ্ঞান, তা এই পাঠশালা থেকেই হয়েছিল; যদিও তখন আমার চার পাঁচ বছরের বেশি বয়স হবে না। বাবামশায় যখন আমাকে এই পাঠশালায় নিয়ে গেলেন, তখন আমি লজ্জায় ভয়ে জড়সড় হয়ে মুখ হেঁট করে বসে রইলুম। মনে আছে মনে হল চারিদিকে অপরিচিত মস্ত মস্ত পুরুষ মানুষ (অবশ্য আমার তুলনায়)—তাদের দিকে তাকাতেও পারলুম না। প্রথমে তালপাতায়, যতটা চওড়া পাতা তত বড় অক্ষর আমাকে লিখতে দিলে। তারপর সে লেখা অভ্যাস

হলে কিছু কম চওড়া আট ভাঁজের কাগজে লিখতে দিলে। আর হাত পাকলে শেষে ষোলো ভাঁজের কাগজে লেখালে, সেই হল চূড়ান্ত। মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে নেই বলে আমাকে কেউ কিছু বলত না। কিন্তু ছেলেদের উপর মারধোর হত, সেটা বুঝতে পারতুম। যে ছেলে লেখাপড়ার দিকে চোখ না রেখে এদিক ওদিক তাকাত, তাকে কিরকম শাস্তি দেওয়া হত আমার একটু একটু মনে আছে। সে যত বড় হাঁ করতে পারে সেই হাঁয়ের মাপে একটা ছোট কঞ্চি কেটে তার নীচের ও উপরের দাঁতের মাঝে বসিয়ে দেওয়া হত, কিছুক্ষণ সেইভাবে থাকতে হত। কোন পোড়ো গরহাজির হলে তাকে ধরে আনবার জন্যে গুরুমশায় জনকতক পোড়োকে পাঠাতেন। তারা যখন তাকে ধরে আনত, তখন কি একটা ছড়া বলতে বলতে আসত, তার এক লাইন মনে আছে—"গুরুমশায়, গুরুমশায়, তোমার পোড়ো হাজির।" হাজির হলে পর তার শাস্তি হত। দুরকম শাস্তির কথা মনে আছে। উঁচুতে টাঙানো একটা আড়া বাঁশের সঙ্গে তার দুহাত বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে তাকে বেত মারা হত, এই একটা; আর একটা হচ্ছে বিছুটি গাছ কেটে এনে মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হ'ত, আর তার উপরে তাকে খালি গায়ে গড়াতে বলা হত। মা বাপেরা গুরুমশায়ের কাছে ছেলে দিয়ে যাবার সময় নাকি বলত—দেখবেন, যেন নাক চোখ কান বজায় থাকে। কত দিন যে আমি পাঠশালায় পড়েছিলুম মনে নেই, তবে বোধ হয় ষোলো ভাঁজে লেখা পর্যন্ত শেষ হয়।

আমাদের পাড়ায় আমার সমবয়সী ছেলেমানুষ কেউ ছিল না। আমারও বাইরের লোকের বাড়ী যেতে ভাল লাগ্‌ত না। বাড়ীর লোক ছাড়া অপর কারো কাছে বড় সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হয়ে পড়তুম। আমি একটা ঘরের কোণে বসে নিজের খেলনা নিয়ে খেলতে খুব ভালবাসতুম। সকালবেলায় উঠে সাজি হাতে করে' আমাদের ফুলবাগানে পুজোর ফুল তুলতে যেতে আমার বড় ভাল লাগ্‌ত। ক্রমে যখন পুষ্পপাত্রে পুজোর ফুল দুর্বা বিল্বপত্র কিরকম করে' সাজাতে হয়, কেমন করে শিব গড়তে হয় এইসব শিখলুম, তখন আমার মা আইমাও যেমন খুসি হলেন, আমারও তেমনি আনন্দ হল। আমাদের বাড়ীতে মা আইমা (আমার মায়ের পিসি) আর পিসিমা এঁরা থাকতেন। পিসিমা কখনো আমাদের বাড়ী, কখনো তাঁর শ্বশুরবাড়ী জগন্নাথপুরে থাকতেন। বাবামশায় কলকাতাতেই থাকতেন, কেবল পুজোর সময় একবার করে' বাড়ী আসতেন। আইমার শ্বশুরবাড়ী ছিল মজুমদার পাড়ায়, বোধ হয় আমাদের বাড়ী থেকে আধ ক্রোশটাক্ দূরে। আইমা প্রায়ই আমাকে কোলে করে নিয়ে মজুমদার পাড়ায় যেতেন। পথে পাছে আমার খিদে পায় বলে একটা বাটিতে দুধ-ভাত মেখে সেটা গামছায় বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতেন। মজুমদারেরা এক বড় গুষ্টি ছিলেন, তাঁদের আলাদা আলাদা বাড়ী সব কাছাকাছি ছিল, তার মধ্যে বড়র বাড়ীতে দুর্গোৎসব হত। কেবল সেইখানেই সেই ছেলেবেলায় আমি দুর্গাপুজো দেখেছি। বলির সময় মজুমদার বাড়ীর সব ছেলেরা খুব আহ্লাদের

সঙ্গে চারদিকে ঘিরে দাঁড়িতে দেখত আর বলি হয়ে যাবার পর নাচতে নাচতে পাঁঠার মুণ্ড মাথায় করে নিয়ে গিয়ে দুর্গা প্রতিমার পায়ের কাছে রেখে দিত। আমার কিন্তু আনন্দ হওয়া দূরে থাক্, বলির পাঁঠা আর হাড়কাঠ দেখলে বড় ভয় ও দুঃখ হত। বলির আগে আমি দূরে সরে' গিয়ে চোখ বুজে কানে আঙুল দিয়ে কেবল বলতুম, "হে মা দুর্গা, আমার উপর রাগ কর' না।" বলিও দেখতে পারতুম না, অথচ মা দুর্গা সেজন্যে রাগ করবেন বলে' মনে মনে খুবই ভয় পেতুম। একটা লম্বা ঘরে পুজোর ভোগ রাঁধা হত, সেখানে চক্রবর্তী বাড়ীর মেয়েরা সকাল সকাল স্নান করে এসে রান্না করতেন। আমাদের দেশে সে সময় টাকা দিয়ে রাঁধবার বামুন পাওয়া যেত না। তাই পুজো বা কোন ক্রিয়াকর্মে রাঁধবার লোক দরকার হলে চক্রবর্তী বাড়ীর মেয়েদের অনুরোধ করে ডেকে আনা হত, তারপর কাজকর্ম হয়ে গেলে তাঁদের উপহারের মত কাপড়চোপড় দেওয়া হত।

নরেন্দ্রপুরের কাছাকাছি দক্ষিণদিহি চেঙ্গটে জগন্নাথপুর প্রভৃতি গ্রামে আমাদের এক এক ঘর আত্মীয় ছিলেন। এই সব জায়গায় আমি আইমার সঙ্গে বেড়াতে যেতুম, তিনি আমাকে খানিক কোলে করে খানিক হাঁটিয়ে নিয়ে যেতেন। কোন আত্মীয়ের অনুরোধে হয়ত দুচার দিন তাঁদের বাড়ী থেকেও আসতুম। সব জায়গাতেই প্রচুর আদর যত্ন পেতুম। এইরকম বেড়ানো আমার খুব ভাল লাগ্‌ত। যখন বাড়ী থাকতুম, একা একা খেলনা নিয়ে খেলা করা ছাড়া আমার আর এক আমোদ ছিল ফাঁদ পেতে পায়রা ধরা। আমাদের পশ্চিমের ঘরে কেউ বাস করতেন না, সেখানে ধান চাল ও নানারকম জিনিস থাকত। তারই সামনের উঠোনে একটা দড়ির এক মুখে ফাঁস দিয়ে তার মধ্যে ধান ছড়িয়ে রাখতুম, আর তার আর এক মুখ ধরে আমি ঘরের দরজায় বসে থাকতুম। যেই একটা পায়রা ধান খেতে আসত অমনি আস্তে আস্তে দড়িটা ধরে টানতুম। ক্রমে ফাঁসটা ছোট হয়ে হয়ে তার পায়ে গিরের মত আটকে যেত; তখন তাকে ধরে নিয়ে এসে পুষতুম। কিন্তু অনেক সময় পায়রা ধান খেতে আসতে দেরী করত কিম্বা মোটেই আসত না, তখন আমি মনে মনে খালি মা-কালীর কাছে বার বার মানত করতুম —"হে মা কালী, একটা পায়রা ধান খেতে আসুক; হে মা কালী, তোমায় জোড়া পাঁঠা আর এক বোতল মদ দেব, একটা পায়রা ধান খেতে আসুক।" এইরকম মানত করা আর সুবচনীর পুজো দেওয়া, মোকদ্দমা হারজিতের সময় চারদিকে শুনতে পেতুম। মোকদ্দমা হারজিত এ-সব যে কি ব্যাপার তা কিছুই জানতুম না। কেবল কথাগুলোই জানতুম। তাই আমারও যখন কিছু পাবার ইচ্ছে হত, তখন ঐ জোড়া পাঁঠা আর মদ মা-কালীর কাছে মানতুম। আমাদের বাড়ীর কাছেই এক কালীমন্দির ছিল। কারো মানসিক পূর্ণ হলে, কারো আরোগ্যলাভ বা মকদ্দমায় জিত এইরকম কোন কারণ ঘটলে, তাঁরা সেখানে পাঁঠা পাঠিয়ে দিতেন ও মদ নিয়ে যেতেন। এইরকম কোন উপলক্ষ্যে দেখেছি পাড়ার কতকগুলি বৃদ্ধা নিজেরা মদ ও শুদ্ধি পাঁচ রকমের ভাজা নিয়ে কালীমন্দিরের ভিতর যেতেন। আইমাকে ডাকলে তিনি

আমাকেও সঙ্গে নিতেন, আর নিজেরা কালী ঠাকুরের সামনে বসতেন। মা-কালীর হাতে ছোট একটা পাতলা পিতলের বাটি থাকত, পুরুত ঠাকুর প্রথমে সেই পাত্রটিতে মদ ঢেলে দিতেন। তারপর কুমারী কন্যা বলে সকলের আগে আমার হাতে ঐরকম একটা ছোট বাটিতে মদ দিতেন, আর পাত্রটি আমার বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলে, প্রথম আঙ্গুলে ও কড়ে আঙ্গুলের উপর ঠিক করে বসিয়ে দিতেন। মাঝের আঙ্গুল দুটো মুড়ে রাখতে হত। পরে পুরুত ঠাকুর নিজে এক পাত্র নিতেন ও আর সকলের হাতে এক একটি পাত্র দিতেন। তাঁরাও ঐভাবে ধরতেন আর ডান হাত দিয়ে মদের সঙ্গে সঙ্গে ভাজা খেতেন। যে বৃদ্ধাদের দাঁত নেই তাঁদের জন্য ভাজা গুঁড়ো করা থাকত। কালীমন্দিরের আর একটা অনুষ্ঠান দেখেছিলাম মনে আছে। আমার মা বোধ হয় কারো ব্যামোর সময় মানত করেছিলেন যে, আরোগ্যলাভ হলে কালীর সামনে হাতে ধুনো পোড়াবেন আর বুক চিরে রুধির দেবেন। যেদিন এই ক্রিয়া হবে সেদিন মা আমাকে সঙ্গে নিয়ে কালীমন্দিরে গিয়েছিলেন। পুরুতের কথামত মা কালী-প্রতিমার সামনে আসন হয়ে বসলেন। বুক চিরে রুধির দেওয়ার ব্যাপারটা আমি আর নজর করে দেখিনি, তেমন মনে নেই। দেখলাম, আমার মায়ের দুই হাতের তেলোয় আর মাথার তেলোয় তিনটে বিড়ে রেখে তার উপর পুরুত ঠাকুর তিনটি আগুন-ভরা মালসা রাখলেন। মা স্থির ও আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন আর পুরুত সেই আগুনের উপর ধুনো দিতে লাগলেন। আমি প্রথমে কিছুক্ষণ ভীত চকিত হয়ে দেখতে লাগলুম। তারপর এমন কান্না জুড়ে দিলুম যে কেউ আমাকে থামাতে পারল না। তখন পুরুত ঠাকুর বাধ্য হয়ে বোধ হয় নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তিনটি মালসা নাবিয়ে নিলেন। আমিও মায়ের কোলে গিয়ে খুশি হয়ে গেলুম।

একবার পাড়ার এক সধবা গৃহিণী আমাকে কুমারী পুজো করেছিলেন। তিনি আমাকে স্নান করিয়ে, নতুন কাপড় পরিয়ে একখানা জলচৌকিতে বসিয়ে দিলেন। তারপর ফুল চন্দন এইসব নিয়ে কি পুজোর মত করলেন তা আমার বিশেষ কিছু মনে নেই। বড় বয়সে আমার এই কুমারী পুজোর কথা একজন খ্ৰীস্টান ভদ্রলোকের কাছে গল্প করেছিলুম। তিনি শুনে বেশ খুশি হয়ে বল্লেন, এইরকম আমাদের দেশেও পুজো করে।

আমি খুবই আদরের মেয়ে ছিলুম। আমি যেন এই ক্ষুদ্র সংসারটির কেন্দ্রস্থল ছিলুম। আমার জন্যই সংসারের খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি সকল কাজের ব্যবস্থা হত। আমার ভালমন্দ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে সকলেই ব্যস্ত থাকতেন। পিসিমা সকালে উঠে বাসী কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে প্রথম আমার খাবার ভাত রাঁধতে যেতেন, তাকে যশোরে 'আনালে' ভাত বলত—বোধ হয় স্নান না করে রাঁধা হত বলে। আমাদের দেশ থেকে গঙ্গা দূর বলে এক বোতল গঙ্গাজল রান্নাঘরে টাঙ্গানো থাকত। তাড়াতাড়ি ছেলেপিলের খাবার বা রোগীর পথ্য রাঁধতে হলে স্নান না করে' সেইটে স্পর্শ

করা হত, অর্থাৎ একটু গায়ে মাথায় ছিটিয়ে দেওয়া হত। একবার আমি অনেকদিন পালাজ্বরে ভুগেছিলুম। সে সময়ে আমাকে যে জিনিস খেতে দেওয়া হত, বাড়ীর আর সকলে কেবল সেই জিনিসই খেতেন। আর কোন খাবার জিনিস সে সময়ে বাড়ীতে আনা হত না, পাছে দেখে আমার লোভ হয়, বা না খেতে পেলে মনে কষ্ট হয়। এখনকার স্বাস্থ্যের নিয়ম সম্বন্ধে যা শুনি ও পড়ি, আমার মনে হয় ছেলেবেলায় অনেকটা সেইরকম নিয়মেই আমাদের খাওয়া-দাওয়া হত। পুকুরে ধরা টাট্‌কা মাছ, কখনো কচ্ছপের মাংস, কচ্ছপের ডিম, ঘরের গরুর দুধ, গুলেল দিয়ে কেউ মাঝে মাঝে জলের পাখী বা অন্য কিছু শিকার করে আনলে তার মাংস, নিজের বা কোন বাড়ীর বলির মাংসও প্রায়ই হত, হরিণের মাংস কেউ আনলে বাবামহাশয় খুব খুশি হতেন। আমার বাপের বাড়ী ভক্ত শাক্ত পরিবার। হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস ছাড়া আর সব মাংসই সেখানে খাওয়া হত। সকালে প্রথমে উঠেই তো ঐ 'আনালে' ভাত খেতুম, দুপুরবেলা ভাতের সঙ্গে কতক রকম শাক-তরকারি, টাট্‌কা মাছের ঝোল, কচ্ছপের ডিমের বড়া কিম্বা কচ্ছপের মাংসের ঝোল। বিকেলে ঘরের সর-বসানো দুধ, গরম গরম মুড়কি দিয়ে জলখাবার হত। এই খাওয়াটাই আমার সবচেয়ে ভাল লাগত। রাত্রে মাছের ঝোল ভাত, কোন কোন দিন পাঁঠার ঝোল। আমার যখন কর্ণবেধ হয়, আমি বড় কাঁদছিলুম। লোকে আমাকে এই বলে সান্ত্বনা দিলে যে, হয়ে গেলেই সর-বসানো দুধে গরম মুড়কি খেতে পাব। তখন আমি চুপ করে কান বিঁধতে রাজী হলুম। কাপড়ের মধ্যে একখানা শাড়ি পরতুম, আর শীতকালে একটা দোলাই মাথার উপর দিয়ে ঘাড়ের কাছে গিঁঠ বেঁধে দেওয়া হত। নতুন কাপড় পরবার আগে আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল যে, কাপড়ের একদিক থেকে একটা সুতো বের করে নিয়ে সেটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে 'কাঁটা নাও', 'খোঁচা নাও', 'আগুন নাও', এইরকম বলে' বলে' কাপড়ের অনিষ্টকারী সব জিনিসকে এক এক টুক্‌রো দিয়ে তবে কাপড় পরতে হয়। আর যখন দুধে দাঁত পড়তে আরম্ভ হল, তখন দাঁতটি হাতে করে নিয়ে একটা ইঁদুরের গর্ত খুঁজে 'ইঁদুর, পড়া দাঁত তুমি নাও, তোমার দাঁত আমাকে দাও' বলে সেই গর্তে ফেলে দিতে হত। এই কথাটা বিশেষ করে আমার মনে আছে এইজন্যে যে, বিয়ের পরে যখন বাকি দুধের দাঁতগুলি পড়ত তখন কলকাতার সেই পাকা ইঁট-চুনের বাড়িতে দাঁত ফেলতে ইঁদুরের গর্ত কোথায় খুঁজ্‌ব তা ভেবে পেতুম না। এখন সর্বদা শুনতে পাই যে, খোলা বাতাসে থাকা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে একটা বড় দরকারী জিনিস। আমি বাপের বাড়িতে যেরকম ঘরে থাকতুম তাতে দিনরাত খোলা বাতাসেই থাকা হত। বাড়ীর নিচের ভাগটা সমস্ত মাটি দিয়েই করা হত, এতটা উঁচু করা হত যে চার পাঁচটা ধাপ উঠে তবে মেঝেতে পৌঁছন যেত। আমাদেব উত্তরের ঘরটা সব চেয়ে বড় আর সবচেয়ে উচু ছিল, আরও বেশি ধাপ উঠে তাতে যেতে হত। প্রত্যেক ঘরের সামনে সমান লম্বা একটা বারান্দা ছিল, আর ঘরের চারিদিকটা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেই বেড়ার বাঁশ কিছুদিন ভিজিয়ে

রেখে, লম্বাদিকে চিরে দুখানা করে সেই এক এক ভাগকে দা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে সরু জালির মত করা হত। সেই জালি বাঁশের বেড়ার ভিতর দিয়ে আলো হাওয়া যথেষ্ট প্রবেশ করতে পারত, আবশ্যকমত জানালা দরজাও রাখা হত। কাঠের কপাটের উপর নানারকম ফুল পাতার তোলা কাজ নিজের নিজের রুচি অনুসারে করা হত। ঘরের উপরে বেশ পরিষ্কার কাটাছাঁটা খড়ের চাল থাকত। বারান্দার মেঝে রোজ সকালে গোবর মাটি জল গুলে লেপন করা হত, সমস্ত উঠোনটা গোবর মাটির ছড়া দিয়ে ঝাঁট দিয়ে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হত। কোন জায়গায় আবর্জন জমা করে রাখা গৃহিণীর পক্ষে বড় লজ্জার বিষয় ছিল।

আমার ছেলেবেলায় কতকগুলি জিনিসে খুব আমোদ হত। তার মধ্যে হরির লুট ছিল সবচেয়ে স্মরণীয় অনুষ্ঠান। নিজেদের বা অন্য কারো বাড়ী অসুখ-বিসুখ বিপদ-আপদ হলেই হরির লুট মানা হত। যেখানেই হোক না কেন, পাড়ার সকলেই তাতে যোগ দিত। দেবতা অধিষ্ঠিত কোন বট অশ্বত্থ বা বড় পুরনো গাছতলায়ই প্রায় হরির লুট দেওয়া হত। পাড়ার সকলের সঙ্গে আইমা আমাকেও কোলে করে নিয়ে সেই জায়গায় যেতেন। বাতাসা ছড়ানো আরম্ভ হলে তিনি আমাকে কুড়োবার জন্যে কোল থেকে নাবিয়ে দিতেন। মস্ত লম্বা হাত-পাওয়ালা লোক সব ছুটোছুটি করে হরির লুট কুড়োতেন, আমার ক্ষুদে ক্ষুদে হাত পা তার ভিতরে প্রায় কিছুই কুড়োতে পারত না। কুড়োবার খানিক চেষ্টা করে শেষে কাঁদতে কাঁদতে আইমার কাছে এসে দাঁড়াতুম, তিনি কোলে করে আমাকে সান্ত্বনা দিতেন। আর সেদিনকার কর্তা বা কর্ত্রী আমার কান্না দেখে আবার কিছু বাতাসা আনিয়ে আমার সামনে ছড়িয়ে দিতেন। তাঁদের কথায় সেই বাতাসা নিতুম বটে কিন্তু আগে সকলের সঙ্গে কুড়োতে পারিনি—সে দুঃখটা মন থেকে যেত না। এক এক দিন পাড়ার মেয়েরা সব পরামর্শ করে ঠিক করতেন 'জাগরণ' করবেন, পূর্ণিমার রাত্রেই প্রায় করা হত। মেয়েদের সব ঘরকন্নার কাজ খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে পুরুষরা সব শুতে গেলে, যেবার যে বাড়ীতে জাগরণ হবে সেখানকার পরিষ্কার উঠোনে মাদুর পাতা হত। গ্রামের সব মেয়েরা পান হাতে করে এসে জুটতেন, তারপর মাদুরে বসে নানারকম কথাবার্তা হাসি-গল্প এইসব হত। যিনি গাইতে পারেন গাইতেন। আমাদের দেশে ক্ষুদে নাচ বলে একরকম নাচ আছে, তাও কেউ কেউ নেচে দেখাতেন। এইরকমে খুব হাসি আমোদে অনেক রাত কেটে যেত। আমার জাগবার খুব ইচ্ছে থাকলেও খানিক বাদে ঘুমিয়ে পড়তুম। নষ্টচন্দ্রের রাত্রে খুব মজা হত। পাড়াপড়শীর বাড়ী থেকে সেদিন ফল তরকারি প্রভৃতি কিছু একটা চুরি করে আনতেই হবে, এমন করে যাতে ধরা না পড়ে। নিজের বাগানের চোরকে ধরা আর পরের বাগান থেকে ধরা না পড়ে কিছু চুরি করে আনা—এই নিয়ে খুব ছুটোছুটি হুটোপুটি হাসাহসি পড়ে যেত। আমাকে নষ্টচন্দ্র দেখতে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল, কারণ দেখলে কলঙ্ক হয়। নিষিদ্ধ জিনিসের যেমন ফল হয়ে থাকে, সেইদিকে ঝোঁকটা বেশি বাড়ে, তেমনি

আমারও নষ্টচন্দ্র দেখবার জন্যে খুব একটা ছটফটানি হত, এদিকে আবার কলঙ্কের ভয়ও খুব হত। যদিও 'কলঙ্ক' কথাটা ছাড়া তার মর্মার্থ কী তা জানতাম না, বুঝতামও না। এক একবার চোখ বুঁজে আকাশের দিকে মুখ তুলে একটা চোখ একটুখানি খুলে অল্প দেখে নিয়ে তখনই ভয়ে ভয়ে মুখ নিচু করতুম।

আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি নানারকম জাতের লোকেরা বাস করত —ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণেতর জাত, মুসলমান প্রভৃতি। আমার এখন মনে হয় তাদের সকলের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার ও কথাবার্তায় বেশ একটা সহজ স্বাভাবিক আত্মীয়তার ভাব দেখতে পেতুম। সকলের সঙ্গেই যেন সকলের একটা কিছু পাতানো সম্পর্ক থাকত। মা মাসি দিদি দাদা যেখানে পাতানো না থাকত, সেখানে বয়স অনুসারে কায়েত ঠাকরুণ, মুখুজ্যে মেয়ে বা ঘোষ মশায়—এইরকম কিছু বলা হত। এরকম সম্বোধন কেমন বেমালুম বাংলা ভাষার সঙ্গে মিশে যায়, যেমন ফুলের সঙ্গে ফুল গাঁথা। আর 'মিস্টার', 'মিসেস্', 'মিস' এই সব শব্দগুলি শুনলে মনে হয় যেন ফুলের গাঁথ্নীর ভিতের মাঝখান থেকে কঠোর খন্‌খনে ঝন্‌ঝনে ধাতুর টুকরো এসে পড়ল। মুসলমান ও হিন্দু পাড়াপড়শীর ভিতরেও এরকম সম্পর্ক পাতানো থাকত। আমার মনে আছে একটি মুসলমান মেয়ে আমার আইমাকে মা বলেছিল। আইমা তাকে মেয়ে বলতেন আর তার স্বামীকে জামাই বলতেন, ও জামাইষষ্ঠীর সময় তাকে রীতিমত জামাইষষ্ঠী দিতেন। ঘরসংসারের কাজকর্ম সারা হয়ে গেলে বিকেলবেলা সকলে পরস্পরের বাড়ী যাওয়া-আসা করত। মুসলমান চাষীরা সূর্যোদয়ের আগে মিষ্টি খেজুর রস এনে আমাদের খেতে দিত, আর রাত্রি নটা দশটায় সব চেয়ে মিষ্টি যে জিরেন রস তাই আনত, আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে খাওয়ানো হত। বাপের বাড়ী ছেড়ে অবধি সেরকম রস আর কখনো খাইনি। খুব সুগন্ধ নতুন খেজুর গুড়ও তারাই এনে দিত, তেমন গুড়ও আর কখনো পাইনি। পুকুরধারের বড় কলাবাগানে মা একজন গরিব ক্যাওড়াব মেয়েকে থাকতে জায়গা দিয়েছিলেন, সে সেখানে ঘর বেঁধেছিল। সে আমাদের উঠোনের ছড়া ঝাঁট-এর কাজটা করত, ওঁরা তাকে খেতে দিতেন। তার একটু পয়সা রোজগার করবার দরকার হলে সে মাকে এসে বলত—মা ঠাকরুণ, একখানা ভাল কাপড় আর কিছু গয়না যদি আমাকে দেন তো আমি সাজগোজ করে দুচার বাড়িতে গিয়ে ক্ষুদে-নাচন নেচে কিছু পয়সা যোগাড় করে আনতে পারি। মা তাকে একখানা ভাল শাড়ি ও কিছু গয়না দিতেন, সেইগুলো নিয়ে সে নাচ সেরে আবার দু একদিনের মধ্যে ফিরিয়ে দিত, মা তার উপর গঙ্গাজল ছিটিয়ে ঘরে তুলতেন। মুসলমান পাড়াপড়শীরাও মা ও বাবামশায়ের কাছে এসে এমন সহজভাবে আপনার জায়গা বুঝে নিয়ে সেখানে বসত ও গল্প করত যাতে কোন পক্ষের কোন দ্বিধাবোধ বা মনোমালিন্যের কারণ কিছুমাত্র থাক্‌ত না। তাদের বাগানের কোন নতুন ফল বা তরকারি হলে তারা কত

আহ্লাদের সহিত আমাদের এনে দিত। মা বাবামশায়রাও নিজের ঘরের তৈরী বা বাগানের কোন জিনিস কত খুশির সঙ্গে তাদের দিতেন।

বিবাহের কথা

(শ্বশুর বাড়ী)

একবার আমাদের গুরুঠাকুর এসেছিলেন। তাঁকে বাবামশায় জিজ্ঞেস করেছিলেন—কিরকম কন্যাদানে বেশি পুণ্য হয়। তিনি বললেন—সাত বছর বয়সে বিয়ে দিলে, অর্থাৎ গৌরীদানে। ঠিক সেই বয়সেই আমার বিয়ে হয়। কলকাতার ঠাকুরবাড়ী থেকে তখন যশোরে মেয়ে খুঁজতে পাঠাত, কারণ যশোরের মেয়েরা নাকি সুন্দরী হত। যে সব দাসীরা মনিবের পছন্দ ঠিক বুঝতে পারে, তাদের খেলনা দিয়ে তাঁরা মেয়ে দেখতে পাঠাতেন। আমাদের ওখানেও এইরকম দাসী গিয়েছিল।

আমার শাশুড়ীর (মহর্ষির স্ত্রী) রং খুব সাফ ছিল। তাঁর এক কাকা কলকাতায় শুনেছিলেন যে, আমার শ্বশুরমশায়ের জন্য সুন্দরী মেয়ে খোঁজা হচ্ছে। তিনি দেশে এসে আমার শাশুড়ীকে (তিনি তখন ছয় বৎসরের মেয়ে) কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন তাঁর মা বাড়ী ছিলেন না—গঙ্গা নাইতে গিয়েছিলেন। বাড়ী এসে, মেয়েকে তাঁর দেওর না বলে-কয়ে নিয়ে গেছেন শুনে তিনি উঠোনের এক গাছতলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর সেখানে পড়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে মারা গেলেন। আমার দিদিশাশুড়ীও খুব সুন্দরী ছিলেন শুনেছি। তাঁকেও নাকি মনুবুড়ি বলে এক পুরনো দাসী পছন্দ করে এনেছিল।

আমাকে বোধ হয় দাসী পছন্দ করে' গিয়েছিল। যখন আমার বিয়ের দিন সব ঠিক হয়ে গেল, তখন তাঁরা আমাকে আনতে সরকার চাকর দাসী ইত্যাদি পাঠালেন।

বিয়ের পর বাসী বিয়েতে আমাকে মেয়েপুরুষ মিলে ঘেরাটোপ দেওয়া পালকিতে নিতে এসেছিল। শ্বশুরবাড়ীর অন্দরমহলে যখন পালকি নামাল তখন বোধ হয় আমার শাশুড়ী আমাকে কোলে করে' তুলে নিয়ে গেলেন। তাঁর ভারী মোটা শরীর ছিল, কিন্তু আমি খুব রোগা ও ছোট ছিলুম বলে' কোলে করতে পেরেছিলেন। আমাকে নিয়ে পুতুলের মতো এক কোণে বসিয়ে রাখলেন। মাথায় এক গলা ঘোমটা, আর পায়ে গুজরী-পঞ্চম ইত্যাদি কত কি গয়না বিঁধছে। আমার পাশে একজন গুরুসম্পর্কীয়া বসে যৌতুকের টাকা কুড়োতে লাগলেন। আমি তো সমস্তক্ষণ কাঁদছিলুম। আমার শ্বশুর যখন যৌতুক করতে এলেন তখন একটু জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলুম। তিনি জিগ্যেস করলেন—কেন কাঁদছে? লোকে বললে—বাপের বাড়ী যাবার জন্যে। তাতে তিনি বললেন—বল পাঠিয়ে দেব। সকলে বলতে লাগলেন—দেখেছ কী সেয়ানা বউ! ঠিক তাকমাফিক চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছে, যখন শ্বশুর যৌতুক করতে এসেছে। কিছুদিন পর্যন্ত লোকে আমাকে রোজই দেখতে আসত ও নানারকম ফরমাশ করত—উপর বাগে চাও তো মা ইত্যাদি। মেয়েরা কাপড় পর্যন্ত খুলে দেখত। আমি খুব লাজুক ছিলাম।

সমবয়সীদের সঙ্গে ভালভাবে কথা কইতুম না। ক্রমে ক্রমে সে ভাবটা কেটে গেল।

সেকালে আমাদের অন্দরমহলে এক ছেলে-মানুষ-করা পুরনো লোক ছাড়া কেউ আসতে পারত না। বিবাহিত লোকেরা ছাড়া কেউ রাতে বাড়ীর ভিতর আসতেন না, কিন্তু কখন কখন দিনে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে আসতেন। আমার পাঁচজন নন্দাইদের একজন ছাড়া সকলেই ঘরজামাই ছিলেন। নন্দাইরা প্রায় সকলেই কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে, হয়ত কলকাতায় পড়তে এসেছেন, সুন্দর চেহারা দেখে এঁরা ধরে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। আমাদের পিরালী ঘরে বিয়ে করবার পরে তাঁদের নিজেদের বাড়ীর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকত না। একজনের বাপ গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে তাঁর ছেলেকে শাপ দিয়েছিলেন শুনেছি।

আমার বড় ননদ সৌদামিনী দেবী আমাদের খুব যত্ন করতেন। বাপের বাড়ীর জন্য যখন কাঁদতুম তখন সান্ত্বনা দিতেন, চুল বেঁধে দিতেন—সে সব তখন কিছুই জানতাম না। ক্রমে ক্রমে যখন ওঁদের সঙ্গে মিশে গেলুম তখন অন্দরমহলে বেশ সুখেই ছিলুম। দাসীরা গঙ্গা নাইতে গেলে বলতুম ছোট ছোট নুড়ি কুড়িয়ে আনতে, তাই দিয়ে আমাদের ঘুঁটি খেলা হত। তাস খেলাও বোধহয় শিখেছিলুম, তাতেও খুব আনন্দ পেতুম।

অনেকদিন বাদে বাদে বাবামশায় (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) আসতেন। আগেই বলেছি, তাঁকে ভয় করতুম, তাই বেশি কথা বলতুম না।

আমরা বউয়েরা প্রায় সকলেই শ্যামবর্ণ ছিলুম। শাশুড়ী ননদ সকলেই গৌরবর্ণ ছিলেন। প্রথম বিয়ের পর শাশুড়ী আমাদের রূপটান ইত্যাদি মাখিয়ে রং সাফ করবার চেষ্টা করতেন। তিনি সামনে বসে থাকতেন তক্তপোশের উপর, আর দাসীরা আমাদের ঐসব মাখাত। দিন কতক পরে যতদূর হবার হলে ছেড়ে দিতেন। আমরা মেয়েরা বউয়েরা সকলেই ঠিক তাঁর কথামত চলতুম। আমি বড্ড রোগা ছিলুম। একদিন কাদের বাড়ীর বউরা বেড়াতে এসেছে সেজেগুজে, তাদের বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখে মা বল্লেন, "এরা কেমন হৃষ্টপুষ্ট দেখ দেখি, আর তোরা সব যেন বৃষকাষ্ঠ!" তারপর আমাকে কিছুদিন নিজে খাইয়ে দিতে লাগলেন। আমার একমাথা ঘোমটার ভিতর দিয়ে তার সেই সুন্দর চাঁপার কলির মত হাত দিয়ে ভাত খাওয়াতেন। আমার কেবল মনে হত মা কতক্ষণে উঠে যাবেন আর আমি দালানে গিয়ে বমি করব।

বিয়ের দুতিন বৎসর পরে বাবামশায় মাকে সুদ্ধ নিয়ে এসে কলকাতায় বাড়ী ভাড়া করে রইলেন। মা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্য পালকি পাঠালেন। কিন্তু শাশুড়ী ঠাকরুণ বল্লেন ভাড়া বাড়িতে বউ পাঠাবেন না। আমি তাঁর উপর তো কখন কিছু বলিনি, এই কথা শুনে লুকিয়ে ছাতের এক কোণে বসে কাঁদতে লাগলুম। দাসীদের ভয় করতুম, কেননা তার

মায়ের কাছে লাগিয়ে দিয়ে বকুনি খাওয়াত। এমন সময় উনি মায়ের কাছে কি একটা কথা বলতে এলেন। বড়ঠাকুরঝিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—সে কোথা? বড় ঠাকুরঝি বল্লেন—তার মা তাকে আনতে পালকি পাঠিয়েছেন কিন্তু ভাড়া বাড়িতে মা পাঠাবেন না বলেছেন, তাই সে ছাতে বসে কাঁদছে। উনি এই কথা শুনে তখনি বাবামশায়ের কাছে চলে গেলেন। তিনি বাপের কাছে যত স্পষ্ট কথা বলতেন, এমন আর কোন ছেলে সাহস করত না। বাবামশায় যখন শুনলেন মা এই কারণে আমাকে যেতে দিচ্ছেন না তখন নিজেই বাড়ীর ভিতর চলে এলেন। এসে মাকে বল্লেন—সত্যেন্দ্রর বউয়ের মা তাঁকে নিতে পালকি পাঠিয়েছেন, তুমি নাকি ভাড়া বাড়ী বলে' তাকে যেতে দাও নি? ভাড়াবাড়ী কেন, মা গাছতলায় থাকলেও মায়ের কাছে যাবে, এখনি পাঠিয়ে দাও।—একথা শুনে আমার খুব আহ্লাদ হল। মায়ের কাছে গিয়ে শুধু তাঁকে মা বলে ডাকতে এত আনন্দ হচ্ছিল যে একটা আলাদা ঘরে গিয়ে মা মা বলতে লাগলুম। সামনে বারবার বলতে লজ্জা করছিল।

আমাদের অসুখ বিসুখ করলে দাসীরা গিয়ে মাকে খবর দিলে তিনি বলতেন, যা দপ্তরখানায় খবর দে গে যা। সেখানকার কর্তা ছিলেন আমার মামাশ্বশুর। তিনি ডাক্তারকে খবর পাঠাতেন।

তখনকার ভাল ডাক্তারদের মধ্যে একজন ইংরেজ ও একজন বাঙালী ডাক্তার আমাদের পরিবারে বাঁধা ছিলেন। একবার মনে আছে একটা অসুখ হয়ে কোণে পড়ে আছি। ডাক্তার এসে আমাকে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দিলেন। মামা নিয়মিত খাইয়ে গেলেন। তারপর পড়েই আছি। আর কোন খোঁজ খবর নেই। আমার বড় ননদ তখন আঁতুড়ে, তা বাঁচিয়ে যতদূর সম্ভব আঁতুড় ঘরের কাছে গিয়েই বসলুম। তখন ভয়ানক খিদে পেয়েছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। বড় ঠাকুরঝির খাবার জন্যে একজন ঘিয়ে ভাজা চিঁড়ে দিয়ে গেল, তাতে বুঝি নাড়ী শুকোয়। তিনি তখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন—খাবে? আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালুম। তখন এত শরীর অবসন্ন বোধ হচ্ছিল যে, লজ্জা করবার অবস্থা ছিল না। সেই চিঁড়ে খেয়ে যেন ধড়ে প্রাণ এল।

আমার শাশুড়ীর একটু স্থূল শরীর ছিল, তাই বেশি নড়াচড়া করতে পারতেন না। সংসারের ভাঁড়ারাদির কাজ বোধ হয় দপ্তরখানা থেকেই করা হত। দৈনিক বাজারে আমাদের কিছু করতে হত না। কেবল পৌষপার্বণে রাশীকৃত পিঠে গড়তে হত বলে লোক কম পড়লে মেয়েদের বউদের ডাক পড়ত। ঝাল কাসুন্দি বড় বড় তোলোহাঁড়িতে করা হত। কাঠি দিয়ে জল মাপা হত, তার আবার অনেক বিচার, একটুকুতেই অশুচি হত। ক্রিয়া-কর্মে আনন্দনাড়ু করবারও ধুম পড়ে যেত। আমার মনে পড়ে বাবামশায় যখন বাড়ী থাকতেন আমার শাশুড়ীকে একটু রাত করে ডেকে পাঠাতেন,

ছেলেরা সব শুতে গেলে। আর মা একখানি ধোয়া সুতি শাড়ি পরতেন, তারপর একটু আতর মাখতেন; এই ছিল তাঁর রাত্রের সাজ।

একবার জমিদারীর আয় কমে গিয়েছিল। তখন আমার শ্বশুর বলে পাঠালেন বউদের রাঁধতে শেখাও। রান্নাঘরের রান্না বড় সুবিধের হত না। দপ্তরখানা থেকে ঘি তেল এনে বামুনরা চুরি করত। কেবল বাবামশায় যখন বাড়ী থাকতেন মা রান্নাঘরে নিজে গিয়ে বসতেন। তখন তারা একটু ভয়ে থাকত। কৈলাস মুখুজ্জে বলে একজন খুব আমুদে সরকার ছিল। ছেলে বাবুদের সঙ্গে রঙ্গরস করত। সে বামুনদের চুরি ধরবার মতলবে এক-একদিন রান্নাঘরে খেত। তারা ফন্দি করে কাঁচাকাঠ উনুনে দিয়ে খুব ধোঁয়া বার করলে, যাতে মুখুজ্জে দেখতে না পায়। কিন্তু চোরাই মাল রাখবে কোথায়? তাই একজন বামুন নিজের পেটে চালাবার উপক্রম যেই করেছে অমনি কৈলাস চোখমুখ পুঁছে তাকে ক্যাঁক করে চেপে ধরেছে। আমরা রান্নাঘরের রান্না অল্পই খেতুম। তবে দুএক টাকা করে মাসহা্রা পেতুম, তাই দিয়ে কখন কখন সখ করে কিছু খাবার আনিয়ে আমোদ করে খেতুম। একাদশীর দিন দাসীরা পয়সা চাইত, দু এক পয়সা পেলেই খুশি হয়ে যেত। তাদের দিয়ে কখন কাঁচা আম কি জারক লেবু আনাতুম। মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে লেবু খেতে খেতে ছাতে পায়চারি করতুম। ছেলে বাবুদের মাসহারা বেশি ছিল।

মা বোধ হয় কৃপণতা করে বাজারের টাকা থেকে কিছু বাঁচাতেন কারণ কর্তামশায় প্রায় পাহাড়ে ভগবানের ধ্যান করে বেড়াতেন বলে কবে বাড়ী আসবেন তাই গুণে বলে দেবার জন্যে দৈবজ্ঞদের পয়সা দিতেন। এক আচার্যানী ও তার ছেলে আসত—তারা তাঁর কল্যাণের জন্য স্বস্তি স্বস্ত্যয়ন করতে বলত, সেজন্য মা মুক্তহস্তে ব্যয় করতেন। মা তাঁর জন্য শুয়ে শুয়ে কেবল ভাবতেন, তাই সংসারের কাজে বড় একটা মন দিতে পারতেন না। এতে অযথা অনেক ব্যয় হত বলে ছেলেরা দরোয়ানকে বলে আচার্যানীর আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু মা সে কথা টের পেয়ে কান্নাকাটি বকাবকি করাতে সে আবার এল।

এই সময়ে মায়ের খুড়ী, কাকার দ্বিতীয় পক্ষের বিধবা স্ত্রী মায়ের কাছে থাকতে এলেন। তিনি এসে মায়েব ও আমাদের খাওয়া-দাওয়া দেখাশুনো আর অসুখে সেবাশুশ্রূষা করতে লাগলেন; তিনি এসে সবদিকে সকলের সুবিধা হল। তাঁকে আমরা দিদিমা বলতুম। তাঁর ছেলেপিলে ছিল না, তাই ক্রমে আমাদের ওখানেই রয়ে গেলেন। তিনি প্রায় মায়েরই সমবয়সী ছিলেন ও তাঁর বেশ সঙ্গিনী হলেন।

আমরা তখন শুধু একখানা শাড়িই পরতুম—তার উপর শীতকালে সন্ধ্যাবেলায় হয়ত একটা দোলাই গায়ে দিতুম। বিয়ের আগে ছেলেরা বাইরেই থাকত, বিয়ে হলে সকলেরই একখানা আলাদা ঘর হত, সেখানে রাত্রে শুতে আসত। ওঁর এক বন্ধু ছিলেন মনোমোহন ঘোষ। ওঁর ইচ্ছে যে তিনি আমাকে দেখেন—কিন্তু আমারত বাইরে যাবার জো নেই, অন্য পুরুষেরও

বাড়ীর ভিতরে আসবার নিয়ম নেই। তাই ওঁরা দু'জনে পরামর্শ করে একদিন বেশি রাত্রে সমান তালে পা ফেলে বাড়ীর ভিতরে এলেন। তার পরে উনি মনোমোহনকে মশারির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়লেন। আমরা দুজনেই মশারির মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে রইলুম; আমি ঘোমটা দিয়ে বিছানার এক পাশে আর তিনি ভোম্বলদাসের মত আর এক পাশে। লজ্জায় কারো মুখে কথা নেই—। আবার কিছুক্ষণ পরে তেমনি সমান তালে পা ফেলে উনি তাঁকে বাইরে পার করে দিয়ে এলেন।

মনোমোহনের সঙ্গে ওঁর খুব ভাব ছিল। তিনিই ওঁকে প্রথমে পরামর্শ দিলেন যে—ভিক্টোরিয়া ত আমাদের দেশের লোককে সিবিল সার্বিসে ঢোকবার অনুমতি দিয়ে গেছেন, কিন্তু কেউ এ পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে যায়নি। চলনা দেখি আমাদের সিবিল সার্বিসে নেয় কিনা। তিনি ক্রমাগত এইভাবে লইয়ে লইয়ে ওঁর বিলেত যাবার মত করালেন। বাবামশায়ের ইচ্ছে ছিল যে সব ছেলেরাই বড় হয়ে জমিদারী দেখে। কিন্তু উনি অনেক বলা-কওয়ায় বিলেত যাবার অনুমতি দিলেন।

আমি প্রথম প্রথম লজ্জায় ওঁর সঙ্গে কথা বলতুম না। লজ্জা আমার অসাধারণরকমের ছিল। তখন উনি একবার বলেছিলেন যে—তুমি যদি কথা বলো ত যা চাও তাই দেব। তাতে আমি একটা ঘড়ি চেয়েছিলুম, উনিও দিয়েছিলেন। ওঁর বিলেত যাবার সময় অবশ্য সে অবস্থা কাটিয়ে উঠেছিলুম। আমার নাম জ্ঞানদা বলে উনি আমাকে 'জ্ঞেনি' বলে ডাকতেন।

একদিন ওঁর যাবার সময় সময় দিদিমার কাছে বসে আমার একটা গান লেখবার সখ হল। এই পর্যন্ত লেখা হয়েছিল—

"কেমনে বিদায় দেব থাকিতে জীবন
তুমি তো যাবে আনন্দে, সঙ্গীগণ লয়ে সঙ্গে"—

তারপরে আর এগোয় নি।

সেই কাগজটা আমি ঘরে ফেলে গিয়েছিলুম, দিদিমা আবার ওঁকে সেটা দেখালেন। তারপর উনি এই গানটা রচনা করে ফেল্লেন—

কেমনে বিদায় দিব থাকিতে জীবন—
কোন প্রাণে যাব চলি বিজন গহন।

কেমনে ছাড়িব তারে সদা প্রাণ চাহে যারে
কেমনে সহিব বল বিচ্ছেদ দহন।
শরীর যদিও যাবে— মন সদা হেথা রবে
যার ধন তারই কাছে রবে অনুক্ষণ।
দিবস ফুরায় যত, ছায়া যায় দূরে তত
কভু না ছাড়ায় তবু পাদপবন্ধন।

তাঁর গান লেখার খুব অভ্যাস ছিল, ব্রহ্মসঙ্গীত অনেক রচনা করেছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের দিকে ওঁর খুব ঝোঁক ছিল, এবং বোধ হয় সেইটেই জীবনের ব্রত করবার ইচ্ছে করেছিলেন। মনে আছে একবার বলেছিলেন— আমি যখন প্রচার করতে বেরব তখন ত রাত জাগতে হবে, বৃষ্টিতে ভিজতে হবে। অবশ্য বিলেত যাওয়াতে সে সাধ পূর্ণ হল না। কিন্তু সেখান থেকেও ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করে পাঠাতেন; এক একটা নতুন গান পেয়ে মহর্ষি খুব সন্তুষ্ট হতেন।

আমাদের বাড়িতে তখন রোজ উপাসনা হত, রোজ সকালে আমাদের তৈরি হবার জন্য আধঘণ্টা আগে ঘণ্টা পড়ত। তার আগে আমরা কিছু খেতুম না। দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়লে দালানে নেবে যেতুম। মহর্ষি থাকলে তিনিই উপাসনা করতেন, তখন মাও গিয়ে বসতেন। না হয়ত বড়ঠাকুর কিম্বা উনি বসতেন। মেয়েরা একদিকে বসতুম পুরুষেরা আর একদিকে। উপাসনার পর খেতুম লুচি তরকারি দুধ ইত্যাদি। চায়ের রেওয়াজ তখন বড় একটা ছিল না। তারপর নাইতে যেতুম। একতলায় একটা ঘরে বড় একটা চৌবাচ্চা ছিল, সেখানে আমরা সবাই একসঙ্গে আমোদ করে নাইতুম। এ ওর গায়ে জল দিচ্ছে, কেউ সর ময়দা মাখছে, কেউ মাখাচ্ছে। আমার সেজননদ নানারকম মাখতেন বলে ওঁর স্নান সব শেষে সারা হত। তিনি ওই চৌবাচ্চাতেই সাঁতার দিতে শিখেছিলেন। মোটা ছিলেন বলে সহজেই ভাসতে পারতেন। আমার আর শেষ পর্যন্ত সাঁতার শেখা হল না।

স্নানের পর সবাই মিলে গল্প করতে করতে একসঙ্গে খেতুম। রান্নাঘরের রান্না বড় ভাল লাগত না, তাই চচ্চড়ি বা ঝোলের মাছ নিয়ে টক কি কিছু দিয়ে খেয়ে নিতুম। পাতে যা থাকত তা দাসীরা খেত, তাছাড়া আলাদা চাল পেত। তখনকার কালে দাসীদের ১৲, চাকরদের ২৲ ২৷৷০ টাকা এই রকম মাইনে ছিল। পরে ক্রমশ বেড়ে গেল। নতুন দাসী এলে তাদের ঘরের কথা জানতে আমাদের খুব আমোদ বোধ হত। তার স্বামী আছে কিনা, তাকে ভালবাসে কিনা ইত্যাদি। দাসীদের নিচে আলাদা ঘর ছিল, সেখানে খাবার নিয়ে গিয়ে খেত, কাপড় রাখত।

উনি বিলেত যাবার পর ওঁর মাসহারা আট টাকা আমাকে দেওয়া হল; তাতে নিজেকে খুব বড়লোক মনে করলুম। তার থেকে মাসে মাসে কোন খাবার আনাতুম, দাসীদেরও খাওয়াতে ভালবাসতুম।

বিয়ের পরে আমার সেজদেওর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইচ্ছে করে আমাদের পড়াতেন। তাঁর শেখাবার দিকে খুব ঝোঁক ছিল। নিজের মেয়েদেরও সব লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। আমরা মাথায় কাপড় দিয়ে তাঁর কাছে বসতুম আর এক একবার ধমকে দিলে চমকে উঠতুম। আমি বিয়ের আগেই

লিখতে পড়তে পারতুম আর আমার হাতের অক্ষরের খুব প্রশংসা ছিল। আমার বাবামশায় একটা পাঠশালা খুলেছিলেন। সেখানে মুসলমান পর্যন্ত বড় বড় ছেলেরা যেত; কেবল আমি একলা ছোট মেয়ে ছিলুম। আমার যা কিছু বাংলা বিদ্যা তা সেজঠাকুরপোর কাছে পড়ে। মাইকেল প্রভৃতি শক্ত বাংলা বই পড়াতেন, আমার খুব ভাল লাগত; এখনো লাগে। উনি বিলেত থেকে ঠাকুরপোকে লিখে পাঠিয়েছিলেন আমাকে ইংরিজী শেখাতে, কিন্তু সেটা অক্ষরপরিচয়ের বড় বেশি এগোয় নি। সেজন্য বোম্বাই গিয়ে ওঁর কাছে খুব বকুনি খেয়েছিলুম, বেশ মনে আছে।

তখন বাড়ীর ছেলেদের জন্যে একজন কুস্তিগির পালোয়ান মাইনে করা থাকত। ছেলেরা সকলেই কুস্তি শিখত। কুস্তির জন্য গোলাবাড়িতে একটা আলাদা চালাঘর ছিল। তাতে অনেকটা ঢিলে নরম মাটি কিরকম তেল দিয়ে মাখা থাকত, যাতে পড়লে না লাগে। বম্বে গিয়েও প্রথম প্রথম উনি ঐরকম মাটির আখড়া তৈরি করাতেন। সেজঠাকুরপোই বেশি কুস্তি করতেন। বোধ হয় ছেড়ে দেবার পর যে বাতে ধরল তাতেই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে মারা গেলেন। উনিও দাঁও প্যাঁচ খুব জানতেন। আর শীতকালে ভোরবেলা ঈডেন গার্ডেনে হেঁটে যাবার একটা নিয়ম ছিল। সেখানে দরজা বন্ধ থাকত ও কেউ গেলে সান্ত্রী বলত "হুকুম সর্দার" অর্থাৎ who comes there?

উনি বিলেত যাবার সময় আমাকে দিদিমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলেন। আমার মনে আছে একদিন রাত্রে বেশ জ্যোৎস্না হয়েছে, আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, মাঝখানে দিদিমা, একপাশে উনি আর একপাশে আমি। আমি লজ্জায় কিছু বলছিনে, কিন্তু চোখে একটু একটু জল আসছে। উনি দিদিমার হাতে আমাকে দিয়ে বল্লেন—একে তোমার মেয়ের মত দেখ। ওঁর কথা দিদিমা যথার্থই রেখেছিলেন। আমাকে তিনি খুবই যত্ন করতেন। যখন পূর্ণিমার দিন খুব জ্যোৎস্না হত, আমি কিছুতেই ঘরে থাকতে পারতুম না, ছাতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম। শীতকাল হলে দিদিমাকে আমি একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে দিতুম, বেচারা বুড়োমানুষ বসে থাকতেন। এই জ্যোৎস্না ভালবাসবার কথা ওঁর বম্বের চিঠিতেও পরে উল্লেখ করেছেন।

বিলেত থেকে উনি আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন। আমি লিখতুম কিনা মনে নেই। ফিরে এসে বম্বে থেকে যখন কলকাতায় আসতুম, তখন আমাদের নিয়মিত চিঠি লেখালিখি চলত। ওঁর সে সময়কার খানকতক চিঠি এখনো আমার কাছে আছে। আমার মেয়ে সেগুলো নকল করে দিয়েছে, নইলে পুরনো কাগজ সব খসে খসে পড়ছিল।

বম্বের কথা

মনোমোহন ঘোষ ওঁর সঙ্গেই বিলেত গিয়েছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে ওঁদের যাওয়া হল, কিন্তু তিনি সিবিল সার্বিস পাশ করতে পারলেন না,—উনি করলেন। তবে সেজন্য তাঁর কোনো ক্ষতি হয়নি, কারণ পরে তিনি খুব বড় ব্যারিস্টার হয়েছিলেন। তিনি স্ত্রীর সম্বন্ধে বেশ ভাল ব্যবস্থা করেছিলেন। সমাজে বের করবার আগে তাঁকে কন্‌ভেণ্টে দিয়ে ইংরিজী লেখাপড়া শিখিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু আমার সে সুযোগ হয় নি। তবে সে সময়ে আমাদের খালি এক শাড়ি পরা ছিল, তা পরে' তো বাইরে যাওয়া যায় না। তাই উনি কোনো ফরাসী দোকানে ফরমাশ দিয়ে একটা কি পোশাক আমার জন্য করালেন,—বোধহয় তাদের মতে Oriental যাকে বলে। সেটা পরা এত হাঙ্গাম ছিল যে ওঁর পরিয়ে দিতে হত, আমি পারতুম না। দুচারখানা শাড়িও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম।

কর্তামশায় আমাকে বম্বে নিয়ে যাবার অনুমতি দিলে, আমাকে ঐ পোশাক পরিয়ে ঘেরাটোপ দেওয়া পালকি করে জাহাজে তুলে দেওয়া হল। জাহাজে অপরিচিত বিদেশী খাবার খেতে আমি অভ্যস্ত ছিলুম না। উনিই আমাকে সব করেকর্মে দিতেন। মতি বলে একজন চালাক মুসলমান চাকর সঙ্গে নিয়েছিলেন। উনি সংসারের বিশেষ কিছু বুঝতেন না, তারই হাতে সব ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরে তার বদলী যখন অন্য চাকর এল, তখন বুঝলুম সে আমাদের কত ঠকিয়েছিল। ওঁর যেমন যেমন মাইনে বাড়ত সবই নিয়ে নিত। ক্রমে আমিও সংসারের কাজ একটু একটু শিখলুম।

বোম্বে গিয়ে আমরা প্রথমে মানেকজী করসেদজী নামে এক ভদ্রলোকের পরিবারে গিয়ে উঠলুম। এখান থেকেই সেটা ঠিক হয়ে ছিল। তিনি তাঁর দুই মেয়েকে এখানে লেখাপড়া শিখিয়ে পরে বিলেত ঘুরিয়ে এনেছিলেন। তাদের নাম আইমাই ও সিরীণবাই। ওঁরা বেশ সম্ভ্রান্ত পরিবার ছিলেন, ইংরেজ বড়লোকের সঙ্গে যাতায়াত ছিল। সিরীণবাই এখনও (১৯৩৭ খ্রীঃ) বেঁচে আছেন, বোধহয় নব্বইএর উপর বয়স হয়ে গেছে। একদিন বম্বের লাটসাহেব Sir Bartle Frere ওঁদের ওখানে এসেছেন আর প্রথম দেশী সিবিলিয়ানের স্ত্রী বলে ওঁরা আমাকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি ভদ্রতা করে আমার সঙ্গে অনেক কথা বললেন, কিন্তু আমার তখন যা ইংরিজী বিদ্যার দৌড়, তাঁর এক কথাও বুঝতে পারলুম না। পরে তিনি চলে গেলে উনি আমাকে খুব বকলেন যে, লাট সাহেব তোমার সঙ্গে অত কথা বললেন আর তুমি একটিও উত্তর দিলে না? আমি তাঁকে আর কি বলব। তিনি ভেবেছিলেন হেমেন্দৰ বুঝি আমাকে তৈরী করে রেখেছেন। কিন্তু আমি যে কেবল দুতিন অক্ষর বানান করে পড়তে পারি, তা তো জানেন না। বকুনি খেয়ে আমি ঘরে গিয়ে কাঁদতে লাগলুম, তখন সিরীণবাই এসে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন।

মানেকজীদের বাড়ীতে আমরা মাসকতক ছিলুম। তার মধ্যে বড় মেয়ে আইমাইএর বিয়ে হল। সিরীণবাই চিরকালই অবিবাহিত ছিলেন। মানেকজী খুব আমুদে লোক ছিলেন। ওঁদের সঙ্গে থেকে ওঁদের আচার ব্যবহার কতক কতক জানতে পারলুম আর তাঁদের সঙ্গে লোকসমাজে একটু একটু বেরতে আরম্ভ করে লজ্জা ভাঙতে লাগল। আমি লজ্জায় কথা কইতুম না বলে মানেকজী আমাকে "মুগী মাসি" (বোবা) বলতেন। টেবিলে বসে কাঁটাচামচ দিয়ে খেতে তাঁদের কাছেই শিখলুম। তাঁরা প্রায়ই লোকজন নিমন্ত্রণ করতেন। ওঁদের ভাষা গুজরাটীরই মত; আমার সঙ্গে হিন্দীতেই কথা হত। আমার সেই অদ্ভূত পোশাক ছেড়ে ক্রমে ওঁদের মত কাপড় পরতে লাগলুম। ওরা ডান কাঁধের উপর দিয়ে শাড়ি পরে। পরে আমি সেটা বদলে আমাদের মত বাঁ কাঁধে পরতুম, সায়া পরতুম। ওরা সর্বদাই রেশমী কাপড় পরে, আর মাথায় একটা রুমাল বাঁধে ও একটা সাদা পাতলা পিরাণ মত জামার তলায় পরে। ওদের ধর্মের সঙ্গে এগুলোর সব যোগ আছে। আর আতস বায়রাম বলে একটা ঘরে ওরা সর্বদাই অগ্নিরক্ষা করে। সেখানে বিধর্মীদের যেতে দেয় না। ওরা অগ্নি-উপাসক বলে তামাক পর্যন্ত খাওয়া নিষেধ, যদিও আধুনিক লোকে তা মানে না।

কিছুদিন পরে সরকার থেকে খবর দিলে যে, ওঁকে Asst. Collector হয়ে আমেদাবাদে যেতে হবে। উনি মতিকে কিছু টাকা দিয়ে আগে আলাদা পাঠিয়ে দিলেন, ঘর গুছিয়ে রাখবার জন্য। আমাদের ট্রেনে আর একজন দেশী ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর সঙ্গে উনি ইংরিজীতে কি কথা বলে আমাকে এসে বল্লেন—এক জায়গায় আমাদের নাবা উচিত ছিল সেখানে নাবা হয়নি, অনেক দূর ছাড়িয়ে চলে এসেছি। ঐ ভদ্রলোকটি সুরাটের নবাব । তিনি সে রাত্তিরটা তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখবেন, পরে ঠিক গাড়িতে তুলিয়ে দেবেন। ভাগ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা হল, নইলে কোথায় চলে যেতুম কে জানে। হাতে পয়সাও বেশি ছিল না। তাদের ওখানে বড় বড় মাংসের ডিশ এল। চাকররা হাত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমাদের দিতে লাগল। তাদের ছুরিকাঁটা ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল না। পরদিন সকালে খাইয়ে দাইয়ে তাঁর জাঁকাল জুড়ি গাড়িতে আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিলেন। উনি মাঝে মাঝে এইরকম ভুল করতেন। সিবিল সার্বিস পাশ করলেও সংসারজ্ঞান বেশি ছিল না। এই গল্প শুনে মানেকজী খুব হেসেছিলেন ও লোকজন এলে বলতেন—Do you know how Tagore went to Ahmedabad? বম্বে মাঝে মাঝে আসতে হলে আমরা তাঁদের বাড়িতেই এসে থাকতুম। তাঁরা আমাদের খুবই যত্ন করতেন। ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরং বলে আর এক মারহাট্টি পরিবারের সঙ্গেও আমাদের খুব ভাব হয়েছিল। আনা, দুর্গা ও মানিক বলে তাঁর তিনটি মেয়ে ছিল । গোবিন্দ্ কড়কড়ে বলে এক খ্রীস্টান মারহাট্টি বন্ধুও আমাদের ছিল। তাঁর বিস্তারিত ইতিহাস ওঁর আত্মজীবনীতে আছে।

বম্বেতে ব্রাহ্মসমাজকে বলে প্রার্থনাসমাজ। আমরা যেখানেই যেতুম প্রার্থনাসমাজে যেতে হত। মারহাট্টি গুজরাটি সব ভাষাতেই ওঁকে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। আমিও শুনে শুনে একটু বুঝতে শিখেছিলুম। ওখানকার মেয়েদের সঙ্গে দেখা হলে তারা নিজের ভাষা বলত, আমি হিন্দী বলতুম। ক্রমে হিন্দুস্তানী শিখে গিয়েছিলুম।

আমাদের সঙ্গে বোম্বাই প্রবাসে ওঁর ভাইবোনদের মধ্যে কেউ না কেউ প্রায়ই থাকতেন, আমরা তাঁদের অনুরোধ করে নিয়ে আসতুম। আমার দেবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ আর আমার ননদ স্বর্ণকুমারী—এঁরাই প্রথমদিকে গিয়েছিলেন । আমেদাবাদের পর মহারাষ্ট্র, গুজরাট, সিন্ধুদেশ, কানাড়া প্রভৃতি বোম্বাইয়ের সব প্রদেশেই ক্রমশঃ বদলি হয়ে হয়ে ঘুরেছি। উনি যেখানে যেখানে যেতেন সেখানকার ভাষা শিখতে হত। একবার মনে আছে কানাড়ী ভাষায় পরীক্ষা দিলে উনি ১০০০৲ টাকা পুরস্কার পাবেন, সেই ভরসায় উনি বম্বে গিয়ে ৩০০০৲ টাকার আসবাবের ফরমাশ দিয়ে এলেন ; অথচ পরীক্ষায় পাশ হলেন না। অগত্যা বাবামশায়কে তার করলেন ৩।৪০০০৲ টাকা পাঠাতে । কি উত্তর আসে সেই ভাবনায় আমরা দুজনে বসে বসে Huntley Palmersএর এক টিন বিস্কুট সামনে রেখে এক একটা করে খাচ্ছি। তারপরে তার এল যে টাকা দিতে পারবেন না। সারাদিন আমরা মুখ শুকিয়ে বসে রইলুম—পরে সন্ধ্যায় টাকা এল। মানেকজী এই কথা শুনে বলেছিলেন—prodigal son of a thrifty father!

ওঁর অল্প বয়সে অনেকদিন ধরে পায়ে বাতের ব্যথায় ভুগেছিলেন। তাই আমরা মাঝে মাঝে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য যেতুম ও লম্বা ছুটিতেও যেতুম। আমরা বাড়ী গেলে আত্মীয়স্বজন খুব খুশি হতেন। ওবাড়ীর খুড়তুতো ভাইরা, বিশেষ গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ওঁর কাছে সর্বদা এসে বসতেন। তিনি খুব সুপুরুষ ও রাশভারি ছিলেন। তখনকার কালে একজন গরীব নাট্যকারকে দিয়ে প্রথম এক নাটক লিখিয়ে অনেক খরচ ও ধুমধাম করে নিজের বাড়ীতে অভিনয় করিয়েছিলেন। আমাদের বাড়ীর দুএকটি ছেলে অভিনয়ে যোগ দিয়েছিলেন। নাটকটির নাম বোধহয় নবনাটক। আমাদের মেয়েদের দেখবার জন্যেও আলাদা জায়গা করে দিয়েছিলেন ।

একবার এমনি যখন কলকাতায় এসেছি, উনি আমাকে লাটসাহেবের বাড়ীর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন । নিজে অসুস্থ বলে যেতে পারেন নি, আমাকে এক মেমের সঙ্গে পাঠালেন—বোধ হয় Lady Phaer। বড় ঠাকুরঝি আমাকে মাথায় সিঁথি প্রভৃতি দিয়ে খুব সাজিয়ে দিলেন, উনি শুয়েছিলেন, তাঁকে আবার নিয়ে গিয়ে দেখালেন। সেখানে ঠাকুরগুষ্টির যাঁরা ছিলেন তাঁরা ঠাকুরবাড়ীর একজন বউ গিয়েছে শুনে লজ্জায় চলে গেলেন —পরে শুনলুম। ওঁকে ছেলেবেলায় একজন পড়িয়েছিলেন, তিনি আমার পরিচয় পেয়ে কাছে এসে কথা বল্লেন। তখনকার লাটসাহেব কে ছিলেন ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় Lord Lawrence। বাড়ীর সকলে বল্লেন যে

উনি নিজে গেলে ভাল হত, অন্য লোকের সঙ্গে পাঠানো ভাল হয়নি। শুনেছি আমাকে অনেকে মনে করেছিলেন ভূপালের বেগম, কারণ তিনিই একমাত্র তখন বেরতেন। তখন আমি খুবই ছেলেমানুষ ছিলুম। তারপরে অনেকবার অনেক জায়গায় লাটসাহেবের বাড়ী গেছি অবশ্য, তবে শেষ পর্যন্ত হাঁটু নুইয়ে courtesy করাটা ভাল অভ্যাস হয়নি।

প্রথম যখন আমি অন্তঃসত্ত্বা হলুম, তখন আমি কিছু বুঝতুম না বলে দৌড়াদৌড়ি করতুম, তাই দুএকবার সন্তান নষ্ট হয়। তখন আমার দেবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে nine-pins খেলতুম মনে আছে। তাই ওখানকার একজন দেশি ডাক্তার আমাকে বই দিয়েছিলেন, তা পড়ে একটু একটু জ্ঞান হল। এরকম অবস্থায় একবার কিছুদিন একলা জোড়াসাঁকোয় এসে ছিলুম। সেই সময়কার ওঁর চিঠি কখানা আমার কাছে রয়েছে। তাতে দেখি উনি আমাকে বিবি বা মেম রেখে ইংরিজী পড়তে বা বলতে শেখবার জন্য খুব উপদেশ দিতেন। নিজে কি কি বই পড়ছেন তাও লিখতেন। চিরকালই মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা দেবার দিকে খুব ঝোঁক ছিল। বিলেতে স্বপ্ন দেখেছিলেন যেন জোড়াসাঁকোর বাড়ীর ভিতরের খড়খড়ি ভেঙ্গে দিচ্ছেন। কাজেও তাই করেছিলেন। বাইরে কিছু অনুষ্ঠান হলে আমরা ঐ খড়খড়ির বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দেখতুম, তার বেশি কখনও যেতুম না। সেইটেই অন্দরমহলে যাবার পথ। উনি যেদিন বম্বেতে প্রথম dinner party দিলেন, আমার মনে আছে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলুম যে খাবার টেবিলে কিছুতেই বসব না, যদিও টেবিলাদি সব সাজিয়ে দিয়েছিলুম। যেই একজন সাহেব আমার হাত তার হাতের ভিতর নিয়ে টেবিল পর্যন্ত নিয়ে গেল, অমনি আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলুম। পরে অবশ্য খাবার নিমন্ত্রণ করা, টেবিল ভাল করে সাজানো ইত্যাদি আমার খুব অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। রাঁধবার ভাল লোক ছিল বলে আমাদের খানারও সুখ্যাতি হত।

Miss Mary Carpenterকে উনি বিলেতে চিনতেন। তিনি বুড়োবয়সে সখ করে এদেশ দেখতে এসেছিলেন ও আমাদের সঙ্গে কিছুদিন ছিলেন। তখন আমি খুব কমই ইংরিজী বলতে পারতুম, কোনরকম করে তাঁর কথা বুঝতুম। তিনি খুব গোঁড়া একেশ্বরবাদী (Unitarian) খ্ৰীস্টান ছিলেন ও নিজের দেশে জেলে গিয়ে কয়েদী দেখা প্রভৃতি নানা হিতকর কাজ করতেন। রামমোহন রায়কেও বোধ হয় বিলেতে চিনতেন। তিনি এদেশে মন্দির দেখতে চাইতেন না—পৌত্তলিকতা বলে । আহমদাবাদের বেচরদাস নামক একজন ধনী ব্যক্তি তাঁর জন্য একটা নিমন্ত্রণ সভা করে একে একে তাঁর তিন স্ত্রীকে আলাপ করিয়ে দিলেন। First Mrs. Becherdas, তারপরে Second Mrs. Becherdas পর্যন্ত Miss Carpenter কোনরকম করে সইলেন; তারপর যখন Third Mrs. Becherdas এল তখন তাঁর মুর্ছা হয়ে পড়বার উপক্রম, একেবারে চৌকির

উপর হাত-পা ছেড়ে দিয়ে পড়লেন। একজনের যে তিন স্ত্রী থাকতে পারে, এরকম অধর্মের কাণ্ড তাঁর পক্ষে এতই অভাবনীয় যে, একটা কথাও বলতে পারলেন না।

যে সূর্য্যকুমার চক্রবর্তীকে দ্বারকানাথ ঠাকুর ডাক্তারী শেখাতে বিলেত নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর বড় মেয়ে Miss. Carpenterএর সঙ্গে বিলেত থেকে এসেছিল। উনি যখন Miss Carpenterএর সঙ্গে গল্প করতেন আমি তার সঙ্গে ছুটোছুটি খেলা করতুম, যদিও সে আমার বড় ছিল। শ্যামলা রঙের উপর তার মুখশ্বী ভাল ছিল। তাকে আমার দেবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ে দিতে আমার ইচ্ছে হয়েছিল; কলকাতায় এসে তাঁকে দেখিয়েওছিলুম। কিন্তু এই সব দেখেশুনে ওর মা তাড়াতাড়ি তাকে কনভেণ্টে নান্ করে দিলেন, পাছে আমাদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে।

বম্বের কোন্ শহরের পর কোন শহরে বদলি হলুম তা এখন ঠিক মনে করতে পারছিনে। তবে আমার বড় ছেলে সুরেন্দ্রনাথ হবার আগের বছর পুণায় ছিলুম জানি, কারণ আমার ননদ স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম পুত্র ও দ্বিতীয় সন্তান জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল পুনায় হন বেশ মনে আছে, এবং তিনি সুরেনের চেয়ে এক বৎসর বয়সে বড়। স্বর্ণকুমারী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তাঁর বড় মেয়ে হিরন্ময়ীকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে পুণায় যান। যে বাড়ীতে আমরা ছিলুম সেটা উঁচু একতলা, একজন ধনী পার্সীর বাড়ী, বড় বড় ঘর খুব জাঁকালরকম সাজানো ও নদীর ধারে। আমি তখন ছেলেপিলে হবার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বুঝতুম না, আমার স্বামীও ধাত্রী প্রভৃতির কোন ব্যবস্থা করেন নি; পূর্বেই বলেছি তিনি সংসারানভিজ্ঞ ছিলেন। একদিন আমরা দুজনে নদীতে স্নান করে ঘরে ফেরবার পর স্বর্ণ বল্লেন তাঁর অস্বস্তি করছে। আমি পেটে তেল মালিশ করতে লাগলুম,—তারপর হঠাৎ একটা কালো মাথা দেখে ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠে পড়ি কি মরি একেবারে চাকরদের ঘরে ছুটে গিয়ে তাদের একজনের বুড়ী মাকে ধরে নিয়ে এলুম। সে যা দরকার সব করলে, তারপরে অবশ্য দাই প্রভৃতি এসে পড়ল।

আমার বড় ছেলে সুরেনের জন্ম ১৮৭২ খ্বীঃ জুলাই মাসে ঐ পুণাতেই হয়। বড় হয়ে তিনি নিজেই মজা করে বলতেন যে, ইংরেজরা যে জুই জিনিস চক্ষে দেখতে পারে না, আমি একাধারে তাই—Bengali Babu আর Poona Brahmin! আমার পুত্রসন্তান হবার সংবাদ পেয়ে আমার শ্বশুরমশায় আহ্লাদ প্রকাশ করে স্বহস্তে আমাকে আশীর্ব্বাদ করে চিঠি লিখেছিলেন, সেটা আমি পরম সৌভাগ্য মনে করেছিলুম মনে আছে। সুরেনের রং ছেলেবেলায় খুব সাফ ছিল। তার এক বৎসর ও আমার একুশ বৎসর এক সঙ্গে আরম্ভ হল, আমাদের ঠিক কুড়ি বৎসর বয়সের তফাৎ।

পুণার কাছে সিংহগড় বলে একটা পাহাড় আছে, সেটা পেশোয়াদের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। সেখানে সুরেনকে ছেলেবেলায় বেড়াতে নিয়ে

যেতুম মনে পড়ে। মাথায় জরির টুপি পরে খেলে বেড়াত, দেখতে বেশ লাগত।

আমার মেয়ে ইন্দিরার জন্ম হয় বিজাপুরের কালাদ্‌গি শহরে, ১৮৭৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে। সে সময় আমার খুব অসুখ করেছিল ও একজন মেম খুব যত্ন করেছিল মনে আছে। তাই আমার মেয়েকে এক মুসলমানী দাইয়ের দুধ খেতে হয়েছিল, তার নাম আমিনা। আমি ছোট ছেলেপিলেকে চাকর দাসীর কাছে রেখে বাইরে যেতে কখনোই ভালবাসতুম না, তার জন্য উনি কখনো কখনো অসন্তুষ্ট হতেন। এখনকার মেয়ে বউরাও তা করলে আমার ভাল লাগে না, তাদের বকি। পশ্চিমের হিন্দুস্থানী চাকর-দাসী ছোট মেয়েদের বলে বিবি, তাই থেকে আমার মেয়েকে আজ পর্যন্ত আপনার লোক সকলে বিবি বলেই ডাকে। আমার ছেলের রং খুবই সাফ ছিল, তার তুলনায় মেয়ের রং ময়লা হয়েছিল বলে উনি তাকে একেবারে কালো বলে হেনস্তা করতেন প্রথমে; যদিও পরে খুবই ভালবাসতেন। আমি যখন দুই ছেলে নিয়ে প্রথমে বাড়ী এলুম তখন আমার খুব আদর হল। বৌএর ছেলে না হলে আর আদর হত না। বাঁজা বউয়ের আদর নেই। আমার শাশুড়ী বিকেলে মুখ হাত ধুয়ে তক্তপোশের বিছানায় বসে দাসীদের বলতেন অমুকের ছেলে কি মেয়েকে নিয়ে আয়। তারা কোলে করে থাকত, তিনি চেয়ে চেয়ে দেখতেন, নিজে বড় একটা কোলে নিতেন না। যারা সুন্দর তাদেরই ডাকতেন, অন্যদের নয়। তাই আমি ভাবলুম যে মা যদি আমার ছেলেদের ডাকেন তবেই বুঝব যে তারা সুন্দর হয়েছে।

আমরা সিন্ধুদেশে হাইদ্রাবাদ ও শিকারপুরে গিয়েছিলুম। সে দেশটা খুব শুকনো ও গরম। ইংরেজরা নাকি বলে যে ভগবান যখন সক্কর সৃষ্টি করেছেন, তখন নবক সৃষ্টি করবার কী দরকার ছিল? বিকেলে ওঁর কাজ হয়ে গেলে আমরা নৌকো করে সিন্ধু নদে বেড়াতে যেতুম। আর সঙ্গে একটি শিখ ছেলে যেত, সন্ধ্যায় সে গান করত "গগন মে থাল রবিচন্দ দীপক বনে, তারকা মণ্ডল চমকে মোতিরে"—বেশ লাগত। সুরেনের এক চাকর ছিল, তাকে সব কথায় 'ক্যাওয়াস্তে' বলে বলে বিরক্ত করে মারত। শেষকালে সে এক জবাব দিত 'পেট্‌কাওয়াস্তে'। ওখানকার লোকে খুব তীরন্দাজ,—একজনের হাতের তীর আর একজন তীর দিয়ে কাটবে। তাই সুরেনও খুব তীর ছুঁড়তে শিখেছিল।

ওদেশে জলের খুব অভাব। তাই খুব গভীর গর্ত খুঁড়ে কুয়ো করে। আর ছোট ছোট কলসির একরকম মালা দড়িতে বাঁধে, সেটা একটা চাকার উপর লাগিয়ে দেয়। সেই চাকা ঘুরিয়ে দিলে প্রত্যেক কলসিতে জল ভরে যেই কুয়োর মুখে আসে, তখন তার কাছে কাটা একটা নালার মধ্যে জলটা পড়ে যায় ও ক্ষেতের ভিতর চারিয়ে যায়।

ওখানকার 'পাল্লা' বলে একরকম মাছ খুব বিখ্যাত—আমাদের ইলিশ মাছের মত। খালি হাঁড়ির উপর বুক দিয়ে জেলেরা ভাসতে ভাসতে

জাল নিয়ে মাছ ধরতে যায়—ধরে সেই হাঁড়ির মধ্যে রাখে। আমার এক আয়া ছিল, সে বলত—'পাল্লা মচ্ছি খানা, সিন্ধ্ মুলুক ছোড়কে নহি যানা।'

ওখানকার বড় লোকদের বলে মীর। তাদের স্ত্রীরা খুব পর্দানলীন, কারও সামনে বেরয় না। ওঁর সঙ্গে কত লোকের আলাপ ছিল, কিন্তু তাদের স্ত্রীদের কখনও দেখিনি। মিস্ কাপেন্টার আসতে একজন দুপুর রাত্রে তাঁকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল, যাতে কেউ টের না পায়।

আমার আর একটি পুত্রসন্তান বোধ হয় সিন্ধুদেশেই হয়। তার নাম রেখেছিলুম কবীন্দ্র, ডাকনাম চোবি। এই তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ আন্দাজ বিলেত যাই, যতদূর মনে আছে। সেই সময় এক ইংরেজ দম্পতী বিলেত যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে উনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, বোধ হয় ওদের ভাষা কায়দাকানুন শেখবার জন্য। কারণ আমার স্বামী ইংরেজ সভ্যতার খুব ভক্ত ছিলেন। কিন্তু জাহাজে সমুদ্রপীড়ার জন্য আমার বড় কষ্ট হয়েছিল, প্রায়ই শুয়ে থাকতুম। তখন রামা বলে আমাদের এক সুরতী চাকর ছিল, তাছাড়া এক মুসলমান চাকর বিলেত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই দেশে ফিরে গেল। সে জাহাজে আমাদের খুব যত্ন করেছিল।

বিলাতের কথা

উনি আমাদের জ্ঞাতি শ্বীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে আমার বিলেত যাবার কথা লিখেছিলেন। তাঁরা আমাদের নাবিয়ে নিতে জাহাজে লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনি খ্বীস্টান হয়ে খ্রীস্টান কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন বলে তার বাপ প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। সেই অবধি তিনি সপরিবারে বিলেতে বাস করছিলেন। তাঁর দুই মেয়ে ছিল—বলেন্দ্রবালা ও সত্যেন্দ্রবালা, তাঁদের ডাকনাম ছিল বালা ও সতু। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের রং খুব সাফ ছিল। তিনি আদরের ছেলে ছিলেন বলে বাপ অল্প বয়সে যশোরের এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই স্ত্রীর তিনি খুব অতুগত হয়ে পড়েছিলেন, এমন কি পাখার বাতাস দিয়ে ঘুম পাড়াতেন ও দিনরাত কাছে কাছে থাকতেন। সেই স্ত্রী মারা যেতে তিনি খুব অস্থির হয়ে পড়েন, সেই সময় কৃষ্ণ বন্দ্যোঃ নামে এক পাদ্রী তাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে খ্বীস্টান করে ফেল্লেন। বাপের মৃত্যুর সময় নাকি তিনি একবার দেখা করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সব দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল বলে ঢুকতে পারেন নি।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর অত্যন্ত বেঁটে ছিলেন বলে' তাঁর গুষ্টিসুদ্ধ তিন চার পুরুষ পর্যন্ত বেঁটে রয়ে গেছে। বালা ও সতু খুব বেঁটে ছিলেন, চেহারাও তেমন ভাল ছিল না, কেবল খুব চুল ও বড় বড় চোখ ছিল। তখনকার ধরণের ইংরিজী পোশাক পরতেন। তাদের ওখানে যে-সব ইংরাজ ভদ্রলোকের নিমন্ত্রণ হত—হয়ত বিয়ের সম্বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে—তাঁদের মধ্যে একজন আমাকে চুপি চুপি বলেছিলেন যে, এদের বিয়ে করব কি, শরীরে যে কিছু নেই, শুধু কাঠি। বালা ও সতুর শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়নি। আর সকলে মারা গেলে অনেকদিন পর সতু বিষয়-কর্মের পরামর্শের জন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের কাছে কলকাতায় এসেছিল। যদিও জ্ঞানেন্দ্রমোহন বাপের বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, তবু কিছু বিষয় তাঁর ছিল, তার থেকে তাঁর চলত। শেষে তাঁর এক বন্ধু উকীল Ramsdenকে বলেছিলেন যে সে যদি Tagore নাম নেয় ত তাঁর বিষয়ের উত্তরাধিকারী হতে পারবে।

আমরা প্রথম বিলেতে গিয়ে তাঁর বাড়ীতে উঠেছিলুম আর আমার ছেলেদের দেখে খুশি হয়ে বলেছিলেন যে, বেশ ঠাকুরবাড়ীর উপযুক্ত হয়েছে। তাদের খেলনাও দিয়েছিলেন। পরে তিনি আমাদের অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। Miss Sharp ও Miss Donkins বলে দুই মেমের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল। Miss Sharpএর বয়স হয়েছিল, কিন্তু কুমারীর মত বেশ সাজগোজ করে থাকতেন। তাঁর একজন দাসী ছিল, সে তাঁর পাকাচুল কুঁক্‌ড়ে দিয়ে সাজিয়ে রাখত। আমি মনে করতুম তিনি আমার বয়সী, পরে শুনলুম ৪০।৫০ হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে ব্রাইটন গিয়েছিলুম মনে আছে। সেখানে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতুম। তখন একটু একটু কাজ-চালানো ইংরিজী বলতে পারতুৎ। বিলেতে প্রথম বরফ-পড়া দেখে আমি

এত মোহিত হয়েছিলুম যে, পাতলা রেশমী শাড়ি পরেই বাইরে ছুটে গেলুম, আর যেমন পড়ছে কুড়তে লাগলুম। সবাই বারণ করেছিল যে এখন বাইরে যেও না। তার দরুণ খুব অসুখ করেছিল। উপর-হাতে ফুলো হয়ে ভিতরে ঘা হয়ে গেল। তখন Lord Lister আমাকে দেখেছিলেন—যিনি পরে antiseptic বের করেন। বহুদিন পরে যখন দেশে এলুম গুরুচরণ কবিরাজের তেলে সেই নালি ঘা সেরে গেল। বিলেতে অনেক দিন slingএ হাত বেঁধে বেঁধে শেষে এতটা উঁচুর বেশি হাত তুলতে পারতুম না।

বিলেতে আমার যে ছেলেটি অসময়ে হয়, তার মাথাটা ভাল করে হয়নি, শীঘ্রই মারা গেল। তাকে বলেছিলুম দ্বারকানাথ ঠাকুরের গোরের কাছে গোর দিতে। গত বৎসরও হেমলতা বউমারা গিয়ে সেটা দেখে এসেছেন। তার উপরের চোবি বলে' ছোট ছেলেটিও বিলেতে মারা যায়। আমার মনে হয় রামা বলে চাকরটা তাকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে বেশি জোরে জোরে হাঁটাত। আমার এখনো তার জন্য দুঃখ হয়। সে Lily of the Valley ফুলের নাম করতে বড় ভালবাসত মনে পড়ে।

ছেলেদের অসুখের সময় Miss Donkins বলে মেমটি আমাকে খুব সাহায্য করেছিল। সে গৃহস্থের মেয়ে, পরের উপকার করে বেড়াত। ছেলেদের যখন খুব খারাপ অবস্থা, তখন রাত্রি-বেশেই ছুটে বেরিয়ে পড়েছিল ডাক্তার ডাকতে।

বিলেতে প্রায় আড়াই বছর ভিন্ন ভিন্ন ভাড়া বাড়ীতে ছিলুম। উনি মাঝে বিলেতে এলেন, রবিকেও সঙ্গে এনেছিলেন। বালা পিয়ানো বাজাত, সেই সঙ্গে রবি গাইতেন, তাতে সে খুব খুশি হত। দুজনে খুব জমে গেল। রবির মাথা পরিষ্কার করে আমি চুল আঁচড়ে দিতুম। তারপর তিনি গান গাইতে শিখলে খুব সুখ্যাতি পেলেন। ছেলেরা শুনত 'পাপা আসছে, পাপা আসছে'। কিন্তু সেখানে যত ছেলের পাপার রং সাদা দেখে, আর ওঁর রং কালো দেখে বিবি দরজার আড়ালে দরজার আড়ালে লুকিয়ে গিয়ে বল্ল "That's not my Papa!" ওদের 'পাপার' সঙ্গে ভাব করতে অনেক সময় লাগল। কিছুদিন পরে আমরা একসঙ্গে ফ্রান্সে যাই। Mediterranean-এর নীল জল খুব সুন্দর। ফরাসীতে সমুদ্রের নাম "Mer" আর মায়ের নাম Mère-এর একই উচ্চারণ। এই দুইএর তারা তুলনা করত। আমরা Nice-এ একটা হোটেলে ছিলুম। সেখানে ছেলেমেয়েদের একটু একটু ফরাসী শেখাবার জন্ম হোটেলের চাকরদের কাছে নিজে গিয়ে দুধ জল প্রভৃতি চাইতে বলতুম।

আর একটি সুন্দর ছোট সাদা কুকুর সেখান থেকে এনেছিলুম বলে' তার নাম রেখেছিলুম Nicois। দেশে এলে বাড়ীর দু' একটি ছেলে তার ভেউ ভেউ ডাক শুনে ভয়ে খাটের উপর উঠে পড়ত মনে আছে। কিন্তু সে আসলে দুষ্টু ছিল না, কামড়াত না। ট্রেনে তাকে টুকরিতে লুকিয়ে বেঞ্চির তলায় রেখে দিলে সে স্টেশনে থামবার সময় গার্ডকে গাড়িতে আসতে

দেখলে ভেউ ভেউ করে নিজের অস্তিত্ব জাহির করত, তাও মনে আছে। হোটেলে আমার মেয়ের চুল দেখে কোন মেম নাকি বলেছিল যে ঠিক যেন কালো রেশমের মত। তাই আবার বিবি এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলে সে কথা ঠিক কিনা। আর তাকে একটা ছোট পুতুল দিয়েছিলুম; তার সঙ্গে একবাক্স কাপড় ছিল, বদ্‌লে বদ্‌লে পরাবার জন্য। সেই পুতুলটাকে খাবার টেবিলে বিবি রেখে দিত, আর হোটেলের ওয়েটর তাকে ক্ষেপাবার জন্যে তুলে তুলে নিয়ে যেত।

ফরাসীদের জাতীয় সঙ্গীত Marseillaise আমার খুব ভাল লাগত। এখনো একটু একটু মনে পড়ে। ওখানে একটা বাড়ী ছেড়ে যখন আর একটা বাড়ীতে উঠে গেলুম তখন প্রথম বাড়িওয়ালী খুব রেগে গেল, বল্লে —এখানে যেরকম ভাল খাবার পাও সেখানে কী তা পাবে? –একটু একটু ফরাসী বলতে পারতুম। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ফরাসী বলতে পারি কিনা; তাতে আমি বল্লুম—Je ne parle pas francais; তখন তিনি বল্লেন, এইত বল্লে। আর একটা কথা মনে আছে, রাস্তা কোথায় জানতে হলে বলতে হত Par où faut-il prendre pour aller অমুক জায়গায়। Ollendorf-এর একরকম বই পাওয়া যেত তাতে কথাবার্তা চালান একরকম শেখা যায়। ছোট ছেলেপিলে নিয়ে এই অল্প জ্ঞান নিয়ে বিদেশে যে কি করে কাটিয়েছিলুম, আর উনিই বা কি করে এই অবস্থায় আমাকে একলা পাঠালেন তাই এখন ভাবি। অবশ্য সেখানকার লোক আমাকে মায়া করত আর সবাই আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত।

বিলেতে থাকতে Tunbridge Wells, Brighton ও Torquay তে গিয়েছিলুম। সমুদ্রের ধারের জায়গায় ছেলেরা বালি নিয়ে বালতি নিয়ে খেলা করত। দেশের লোকের মধ্যে Mabel Dutt (পরে ওঁর বন্ধু তারকনাথ পালিতের বউ হন) বেশ সুন্দরী ছিলেন। তার বাপ ক্ষেত্র দত্ত মেম বিয়ে করেছিলেন। মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে আসতেন। একদিন মদ খেয়ে গেলাসে অল্প রেখেছিলেন, বিবি সেটুকু খেয়ে ফেলেছিল। সেজন্যে তাকে খুব বকলুম, কারণ তাঁর জিভে একটা অসুখ ছিল। মেবল আমার ছেলেদের চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিল ও তাদের শোবার সময় গল্প বলত। তাতে Beelzebub-এর কথা থাকত, তারা এখনো মনে করে। আর একজন ছিলেন অ্যানি চক্রবর্তী। তার বাপ গুডীব (সূর্যকুমার) চক্রবর্তী দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলেত গিয়ে ডাক্তার হয়ে এসেছিলেন ও মালয় ফিরিঙ্গী মেম বিয়ে করেছিলেন। তার বড় মেয়ে সিসটার বেনেডিক্‌টা নামে নান্ হন আগেই বলেছি। এই অ্যানি ছিলেন তাঁর আর একটি মেয়ে ও তাঁর চেহারায় মাতৃকুলের কিছু ছাপ ছিল। তিনি এদেশে এসে প্যারী রায় নামক ব্যারিস্টারকে বিয়ে করে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে বহু দিন সুখে সচ্ছন্দে সংসার করেন। তিনি সামাজিক মেলামেশায় খুব পটু ছিলেন। তাঁর সঙ্গে অনেক কাল ধরে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর সম্প্রতি পঙ্গু

অবস্থায় বেঁচে আছেন শুনতে পাই, তবে আমার সঙ্গে আর দেখাশুনো হয় না।

আমারও এখন শরীর প্রাচীন ও অপটু। চোখে কানে ভাল দেখতে শুনতে পাইনে। সব কথা ভুলে যাই। সেইটেই আমার বেশী কষ্টকর মনে হয়। কাজেই পূর্বজীবনের কথা ধারাবাহিক ভাবে বলা আমার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তবু আমার মেয়ে ছাড়েন না, তাই তাঁর প্রশ্নের যতটুকু পারি উত্তর দিয়ে যাই। তাতে খাপছাড়া ভাবে কিছু জানা যায় মাত্র।

অর্মাদের পরিবার। বিলাতের একটি বন্ধু পরিবার।

অরুণী। অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র।

আত্মারাম। ডাঃ আত্মারাম পাণ্ডুরঙ, বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা মরাঠী চিকিৎসক।

ইরাবতী । সৌদামিনী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা।

Oliphant। জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরাজ সরকারি কর্মচারী।

কমলা দেবী। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পত্নী।

কর্তা, কর্তামশায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিশোরী। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির জনৈক কর্মচারী।

কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় । সুবিখ্যাত খ্রীস্টান পাদরী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃষ্ণকমল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, উনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সাহিত্যসেবী।

কৃষ্ণধন। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ, গীতসূত্রসারের লেখক।

কেশববাবু। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

কৈলাস মুখুজ্জে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির জনৈক সরকার।

ক্ষেত্র। ক্ষেত্রমোহন দত্ত।

খণ্ডেরাও। বন্ধুস্থানীয় উচ্চপদস্থ মরাঠী সরকারি কর্মচারী।

গুরুচরণ কবিরাজ। সেকালে ঠাকুরবাড়ির একজন গৃহ-চিকিৎসক।

গোবিন্দ। গোবিন্দ বিঠ্‌ঠল কড়্‌কডে, জনৈক মরাঠী অধ্যাপক বন্ধু।

গোস্বামী, গোঁসাই। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী।

চারুচন্দ্র মিত্র, নিলকমল মিত্রের পুত্র। চারুচন্দ্র এলাহাবাদে জননায়ক ও রাজনৈতিক কর্মীরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন।

জানকী। জানকীনাথ ঘোষাল, স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী।

জ্যোতি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র।

তারক। তারকনাথ পালিত। দিদিমা। মহর্ষির খুড়শাশুড়ি।

নীতীন্দ্র। নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র।

নীলকমল মিত্র। এলাহাবাদ বালী নীলকমল মিত্র মহর্ষি ও ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এলাহাবাদে ইঁহার উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজের কাজ চলিত।

নূতন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নেণ্ডু। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, সৌদামিনী দেবীর পুত্র।

প্রসন্ন বিশ্বাস । জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির জনৈক সরকার।

'বন্ধু'। মনোমোহন ঘোষের স্ত্রী।

বর্ণ। বর্ণকুমারী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা।

বিবি। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী।

বীরেন্দ্র। বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র।

বেলী। ইংরাজ চিকিৎসক।

ব্রজমামা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্যালক।

মনো, মনোমোহন। মনোমোহন ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিন্নহৃদয় বন্ধু, বিলাতে সত্যেন্দ্রনাথের সহযাত্রী। ইনি রাজনীতিজ্ঞ ও ব্যারিস্টাররূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

Miss Chuckervutty। অ্যানি চক্রবর্তী, ডাঃ স্বর্যকুমার চক্রবর্তীর কন্যা।

মেজদাদা। গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Mabel Dutt। বিলাত-প্রবাসী ক্ষেত্রমোহন দত্তের কন্যা।

যদু। যদুনাথ মুখোপাধ্যায়; শরৎকুমারী দেবীর স্বামী।

রবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজেন্দ্রবাবু। পারিবারিক চিকিৎসক।

রাধাকান্ত দেব। উনবিংশ শতাব্দীর সুবিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবী।

Lord Lister। সুবিখ্যাত ইংরাজ বিজ্ঞানী এবং শস্ত্র-চিকিৎসক। শস্ত্র-চিকিৎসায় অ্যান্টিসেপ্টিক-এর ব্যবহার প্রবর্তন করেন।

Contributor

 This ebook is auto generated using python from WikiSource (উইকিসংকলন) by bongboi. Thanks to the volunteers over wikisource:

- Bodhisattwa
- Hrishikes
- Jayantanth

 Wikipedia has it's own epub generation system but somehow due to weird Styling and Font embedding those EPUBs invariably slows down the device in which you're reading. And Fonts get broken, some group members on t.me/bongboi_req reported this, so decided to build those concisely via Python.

✌ Utmost care have been taken but due to non-survilance some ebook parts may be broken. If you find such please improve and submit or report to @bongboi_req. So that those can be improved in future

Disclaimer

⚠

⚔ Tele Boi does not own any content of this book. All the copyright is of respective authors/publishers of the books. @bongboi compiled this for Non-profit, educational and personal use, in favour of fair use.

 The content of the book is publically available in the WikiSource.

 Do Not redistribute in a commercial way.

✓ Please buy the hardcopy of the books to support your favourite authors and/or publishers.

সমাপ্তি

পড়ে ভাল লাগলে বই কিনে রাখুন।

 করোনার প্রকোপের সময় বানানো বইগুলি। সবাই সুস্থ থাকুন, সুস্থ রাখুন।

 Bengali Language have very few EPUBs created. @bongboi started creating this as a hobby project and made more than 2000 EPUBs at this stage.

 Be a volunteer @bongboi or at WikiSource so that more ebooks become available to the public at large.

Help People Help Yourself ❤

আরও বই

টেলি বই

MOBI